প্রতিবন্ধিত্ব প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন

জাকির হোসেন
ড. আলতাফ হোসেন

প্রতিবন্ধিত্বঃ প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন

গবেষক

জাকির হোসেন[১]
ড. আলতাফ হোসেন[২]

গবেষণা সহযোগী

শেখ শামীম হাসান
ইমতিয়াজ হোসেন নাফিজ
সাদিয়া ইসলাম

[১] প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ
[২] পরিচালক, বাপসা

প্রতিবন্ধিত্বঃ প্রেক্ষিত মানবাধিকার ও সেবার মান উন্নয়ন

গবেষক
জাকির হোসেন
ড. আলতাফ হোসেন

গবেষণা সহযোগী
শেখ শামীম হাসান
ইমতিয়াজ হোসেন নাফিজ
সাদিয়া ইসলাম

প্রকাশক
নাগরিক উদ্যোগ
৮/১৪, বক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

প্রকাশকাল
জুন ২০১০

কম্পিউটার বিন্যাস ও প্রচ্ছদ
মিঠু আহমেদ

মুদ্রণ
চৌধুরী প্রিন্টার্স এন্ড সাপ্লাই
৪৮/এ/১, বাড্ডানগর লেন
পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

দাম
এক শত পঞ্চাশ টাকা

ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-২০৫৮-২

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা প্রকল্পে অর্থায়ন করার জন্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী, গ্রামীণ ট্রাষ্ট-এর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। গবেষণা কাজ পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পরিচালক ড. সামছুল বারি, মহা-ব্যবস্থাপক জামিল হোসেন চৌধুরী, কর্মসূচী কর্মকর্তা সাদাফ নূরী এবং খন্দকার রিয়াজ হোসেন-এর কাছে বিভিন্ন পরামর্শ পেয়েছি, তাদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণা কাজটি বাগেরহাট জেলার সদর থানায় পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা পরিচালনায় মাঠ পর্যায়ে প্রানন ও রূপান্তর-এর সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা পরিচালনা করা দুরূহ হতো। এই গবেষণা তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন মিঠু আহমেদ এবং প্রতিবেদনটি টাইপ করেছেন মিজানুর রহমান। প্রতিবেদনটি সম্পাদনা করেছেন আইয়ুব হোসেন। এই গবেষণায় যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞ।

বাংলায় প্রকাশিত জাতিসংঘ কর্তৃক প্রনীত 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান' এখানে সংযুক্ত করা হলো। এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বাংলা অনুবাদের সম্পাদক মাহ্বুব কবীর এবং এডিডি, একশনএইড বাংলাদেশ, এনএফওডব্লিউডি, এনজিডিও, প্রতিবন্ধী নারীদের জাতীয় পরিষদ ও ডিজএবিলিটি বাংলাদেশকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা কাজটি ২০০১ সালে পরিচালিত হলেও, বর্তমানে এর প্রাসঙ্গিকতা বিদ্যমান আছে বলে এটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হলো।

সূচিপত্র

প্রাক-কথন ও করণীয় ৭-১০

অধ্যায়-১: প্রতিবন্ধিত্ব: পরিসংখ্যান এবং অবস্থান ১১-৪২

১.১. পৃথিবীর চিত্র
১.২. এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের চিত্র
১.৩. বাংলাদেশের চিত্র
১.৪. প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত কিছু গবেষণা তথ্য
১.৫. প্রতিবন্ধিতার কারণ: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
১.৬. প্রতিবন্ধী এবং মানবাধিকার
১.৭. প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার এবং বাংলাদেশ
১.৮ প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত কার্যাবলী
১.৮.১. সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড
১.৮.২. বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড
১.৮.৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ: উন্নয়ন প্যাকেজ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা

অধ্যায়-২: গবেষণার যৌক্তিকতা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ৪৩-৪৫

২.১. গবেষণার যৌক্তিকতা
২.২. গবেষণার উদ্দেশ্য
২.৩. গবেষণা পদ্ধতি
২.৪. গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

অধ্যায় - ৩: গবেষণার ফলাফল ৪৬-৭০

৩. গবেষণার ফলাফল
৩.১. প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা
৩.২. প্রতিবন্ধিত্বের ধরন
৩.৩. বৈবাহিক অবস্থা
৩.৪. প্রতিবন্ধী খানা প্রধানের শিক্ষা
৩.৫. পেশা
৩.৬. আয়
৩.৭. খানা প্রধানদের সন্তান সংখ্যা
৩.৮. বাসস্থানের ধরন
৩.৯. প্রতিবন্ধীর বয়স
৩.১০ প্রতিবন্ধিত্বের বয়স
৩.১১ প্রতিবন্ধিত্বের কারণ
৩.১২. প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা ও তাদের আগ্রহ
৩.১৩. প্রতিবন্ধী কর্তৃক সংসারের কাজে সহায়তা প্রদান
৩.১৪. প্রতিবন্ধীর প্রতি আচরণ

৩.১৫. প্রতিবন্ধীর পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া
৩.১৬. প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসা করানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ
৩.১৭ প্রতিবন্ধীদের আয়-উপার্জন
৩.১৮. প্রতিবন্ধীর পুনর্বাসন
৩.১৯. প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষা
৩.২০. সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রণীত আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত জ্ঞান
৩.২১. প্রতিবন্ধিতা এবং উত্তরাধিকার
৩.২২. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ
৩.২৩. প্রতিবন্ধী সন্তানকে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া এবং বাহিরে চলাফেরা
৩.২৪. প্রতিবন্ধীর নাগরিক অধিকার
৩.২৫. প্রতিবন্ধীদের বৈবাহিক অবস্থা

অধ্যায় - ৪: জীবনালেখ্য (কেসস্টাডি)-এর আলোকে বিশ্লেষণ ৭১-৭৫

৪.১. শিক্ষা
৪.২. কর্মসংস্থান
৪.৩. আবেগপ্রবণতা; প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন
৪.৪. শারীরিক, মানসিক ক্ষতিসাধন
৪.৫. প্রতিবন্ধীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং স্বাভাবিক শারীরিক বর্ধন
৪.৬. প্রতিবন্ধীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া

অধ্যায়-৫: জীবনালেখ্য ৭৬-১৩৫

অধ্যায়-৬: আলোচনা ও করণীয় ১৩৬-১৩৮

সংযুক্তি ১: জাতিসংঘ- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান ১৩৯-১৭৯

প্রাক-কথন ও করণীয়

আমাদের সমাজে দারিদ্র্য প্রপীড়িত, শিক্ষাবঞ্চিত প্রতিটি মানুষই যেন প্রতিবন্ধী। এ সুস্থ-প্রতিবন্ধীদের ভিড়ে কিছু সংখ্যক প্রকৃত প্রতিবন্ধী তো আমাদের নজরে পড়ার কথা নয়। কেননা, প্রতিবন্ধীদেরকে আমাদের সমাজে লুকিয়ে রাখা হয় পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ন হবার ভয়ে, আবার প্রতিবেশীদের অবহেলা-অনাদরের ভয়েও অনেক প্রতিবন্ধীর বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজনরা বিব্রত বোধ করেন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ কোন-না-কোন প্রকার প্রতিবন্ধী। ১২ কোটির (২০০১ এর হিসাব মতে) লোকসংখ্যার একটি দেশে এ সংখ্যা কম নয়। আমাদের মোট প্রতিবন্ধীর সম-সংখ্যক লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক কম লোকসংখ্যা বসবাস করে এমন দেশের সংখ্যা পৃথিবীতে কম হবে না। সে কারণে নিঃসন্দেহে বলা যায়, আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী মানুষ সংখ্যায় বিপুল। এ বিপুল জনসংখ্যার মৌলিক প্রয়োজনের বিষয়টি চরমভাবে উপেক্ষিত। এদের স্বাস্থ্যসেবা, পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে এ নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে চিন্তাভাবনা তা এখনও কোন প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগত রূপলাভ করেনি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য যে অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। প্রতিবন্ধীদেরকে এখনও উন্নয়নের অংশীদার বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার অবকাঠামো বিনির্মাণ করা যায়নি। আমাদের দেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করার কিছু কিছু পদক্ষেপ শুরু হলেও তা এখন পর্যন্ত আইনগত বৈধতা পায়নি। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোতে প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার জীবনের মানোন্নয়নের জন্য সরকারি অব্যাহত আন্তরিক প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য জাতিসংঘ সনদ এবং এশিয়া প্যাসিফিক ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ করে এনজিও-দের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য যে কর্মকান্ড শুরু হয়েছে তা যদিও প্রয়োজনের তুলনায় কম- তবুও এর ইতিবাচক সূচনাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো যায়। বিলম্বে হলেও বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ, সমাজের অগ্রসর চিন্তার কিছু ব্যক্তির প্রয়াসে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত। পল্লী এলাকায় বসবাসরত প্রতিবন্ধীদের পক্ষে এ সুযোগ গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হলে পলী- এলাকায় বসবাসকারী প্রতিবন্ধী মানুষদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

প্রকৃতঅর্থেই বাংলাদেশের জনগণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এখনও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ ইত্যাদি প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। প্রতিবন্ধী বা তাদের অভিভাবকরাও এর উর্দ্ধে নয়। তাদের অনেকেই মনে করেন, কোন পাপের ফলেই তার সন্তান প্রতিবন্ধী হয়েছে। প্রতিবেশীরাও সংস্কারবশত এমন ধারণাই প্রকাশ করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে প্রতিবন্ধীরা এবং প্রতিবন্ধীর পরিবার উপেক্ষা এবং অবহেলার শিকার হন। প্রতিবন্ধীরা সুস্থ মানুষের অসুস্থ মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত হতে হতে নিজগৃহে বন্দী জীবন যাপন করে অথবা অত্যাধিক সংকুচিত মানসিকতা নিয়ে বসবাস করে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য সমসুযোগ, সমঅধিকার, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ করে দিলে তারা তাদেরকে সমাজে, অর্থনীতিতে এবং সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দেড় বছর বয়সে দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী হয়েও হেলেন কেলার জীবন সংগ্রামে হার মানেননি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রীধারী প্রথম অন্ধ ও মূক ব্যক্তি। লুইস ব্রেইলী যিনি নিজে ছিলেন অন্ধ অথচ অন্ধদের জন্য রেখে গেছেন যুগান্তকারী আবিস্কার-ব্রেইলী পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা। বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিংস একজন শারিরীক প্রতিবন্ধী।

প্রতিবন্ধী যে যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী হতে পারে তার আরও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, বিংশ শতাব্দীর একজন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন। রুজভেল্ট সম্পর্কে তাঁর স্ত্রী এলিনোরা রুজভেল্ট লিখেছেন, "তাঁর দেহ অবশ বা অচল হওয়ায় তা তাঁর মন এবং মননশীলতায় প্রসারিত হয়েছিল। এ অবশতা তাকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করেছিল। এরপর থেকে তাঁর ঔদ্ধত্যে, আত্মতুষ্টি এবং চিন্তা-চেতনার অগভীরতা কমে গিয়েছিল। অপরদিকে, তিনি তাঁর সমস্ত দৃষ্টি নৈমিত্তিক কাজে নিবদ্ধ করতেন। তিনি আরো বেশী করে চিন্তা করতেন এবং আরো বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়েছিলেন। তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন চেতনা ও কাজের মধ্যে এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধির জন্য।" এ অবশতা তাঁর জন্য শাপেবর হয়েছিল বলে বলেছিলেন তার স্ত্রী এলিনোরা রুজভেল্ট। আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ক্রিড়াবিদরা ১৯৯১ সালে চমকে দিয়েছিল দেশবাসীকে। সে বৎসর যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্পেশাল অলিম্পিকে প্রথমবারের মত অংশ নেয় ৫ জন প্রতিবন্ধী, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন স্বর্ণ ও অপর তিনজন রৌপ্য পদক নিয়ে ফিরে আসেন; ৯৫ সালে একই অলিম্পিকে ১৫ জন প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদ অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাভেনে ৫টি স্বর্ণ, ৬টি করে রৌপ্য ও ব্রোঞ্চ পদক লাভ করে। ১৯৯৬ সালে চীনের সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক স্পেশাল অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে ১৩টি স্বর্ণ, ৬টি রৌপ্য ও ৯টি ব্রোঞ্চ পদক লাভ করে। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনায় অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিকে বাংলাদেশের ৪২ জন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণ করে। এখানে বাংলাদেশের বুদ্ধি প্রতিবন্ধীরা ২৩টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য ও

৭০টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। এ সাফল্য কি জাতীয় দলের সুস্থ ক্রীড়াবিদদের সাফল্যের চেয়ে অনেক বড় নয়! একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং সমসুযোগের সৃষ্টি করলে এরাও প্রতিবন্ধকতাহীনদের মত স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেন।

বর্তমান গবেষণায় প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, দারিদ্র এবং প্রতিবন্ধিত্ব, প্রতিবন্ধীদের দৃষ্টিভঙ্গি, পারিবারিক অবস্থা, অভিভাবকদের মনস্তাত্ত্বিক-প্রতিক্রিয়া এবং অন্যান্য আবেগপ্রবণ বিষয়সহ প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি গবেষণা-মনন-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতার পরিবর্তন এবং জনগণকে আংশিকভাবে হলেও সচেতন করার প্রয়াসসহ প্রতিবন্ধীদের মানবিক আর্তির বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে নীতি নির্ধারকগণ বর্তমান গবেষণার আলোকে জনগণকে সচেতনকরণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। কিছুটা হলেও বর্তমান গবেষণা এ বিষয়ে নীতি নির্ধারকগণকে আলোকিত করতে সক্ষম হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করা হবে। এই গবেষণা থেকে জরুরী ভিত্তিতে যা করণীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয় গড়ে তোলা। এই চিকিৎসলয়ে সকল যন্ত্রপাতি ও উপকরণে সজ্জিত থাকবে। শিশুকালে বা জন্মের পরপর কোন এলাকার শিশুর প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে এ কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য সারা দেশে প্রচারণা চালাতে হবে। এটা স্থানীয় প্রশাসন বা কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো করবে।
- প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে বিনামূল্যে এবং বেসরকারি ক্লিনিকে অর্ধমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি সরকারি সহায়ক যন্ত্রপাতি (Assistive device) তৈরীর কারখানা গড়ে তুলে সহজলভ্য ও সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার সুযোগ করে দেয়া।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য সারাদেশে স্কুল ও কারিগরি শিক্ষালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাদের জন্য উপযোগী পাঠক্রম ও অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সমসুযোগে চাকুরীর ব্যবস্থা ও চাকুরীক্ষেত্রে তাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধীদের বিনোদনের জন্য প্রতি জেলায় অন্তত একটি করে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা। এ কেন্দ্রে, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও পাঠাগারের ব্যবস্থা থাকবে।

- বাস, রেল ও উড়োজাহাজে প্রতিবন্ধীদের অন্তত ১০% আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা। ভ্রমণকালে যানবাহন কর্মীরা প্রতিবন্ধীদের সহায়তাদানের মনোভাব গড়ে তোলা। রাস্তা পারাপারকালে প্রতিবন্ধীদের ট্রাফিক পুলিশের সহায়তার বিধান চালু করতে হবে।
- অফিসে, ভবনে চলাচলকালে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী সিঁড়ি তৈরি করা এবং এরকম স্থানে কর্মরত কর্মীদের বাধ্যতামূলক সহায়তা দান।
- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার যেমন বাওবাতাস, জ্বীন-ভূতের আছর, পাপের ফসল ইত্যাদি অপধারণা নির্মূলের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।
- প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত অন্ধধারণা ও কুসংস্কার দূর করতে এবং তাদের জন্য পরিবারে ও সমাজে সহমর্মিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমকে সচেতন করা।
- প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্য ও সমাজের অন্যান্যদের তথ্য সরবরাহ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রথমত কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমৃদ্ধ রেফারেন্স সেন্টার গড়ে তোলা; সেখানে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বই-পুস্তক, জার্নাল এবং কম্পিউটার, ভিডিও, অডিও, ইন্টারনেট সুবিধা ইত্যাদি থাকবে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশ যা অন্তত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক হতে পারে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাজে সকলের, বিশেষতঃ প্রতিবন্ধী পরিবার ও প্রতিবেশীদের আশ্বাস, ভরসা ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধিদের নিয়ে কাজ করছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

সর্বোপরি, প্রতিবন্ধী আইন ও নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সমাজে এমন মনোভঙ্গি গড়ে তোলা যাতে করে স্বাভাবিক মানুষের মতো সামাজিক মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার ভোগ করে প্রতিবন্ধীরা নিজেদের মানুষ ভাবার মতো পরিবেশ পায়।

অধ্যায়-১
প্রতিবন্ধিত্বঃ পরিসংখ্যান এবং অবস্থান

এই অধ্যায়-এ প্রতিবন্ধিত্বের ব্যাপকতা, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি, নীতিমালা এবং বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনা থেকে মূল বিষয় সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

১.১. পৃথিবীর চিত্র

পৃথিবীর সব মা'ই শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার পর, সম্বিৎ ফিরে পেলে নিকটস্থদের প্রথম প্রশ্ন করেন সন্তানটির সব ঠিক আছে কিনা অর্থাৎ কোন অঙ্গহানি বা অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে কিনা! এ প্রশ্ন চিরন্তন। বাবারও একই উদ্বেগ থাকে। সন্তানের অঙ্গহানি বা অপ্রকৃতস্থ অবস্থা কারোরই কাম্য নয়। না মা-বাবার, না পরিবারের, না সমাজের। কিন্তু আমরা না চাইলেও এ পৃথিবীতে বর্তমানে প্রতি ১০ জনে ১ জন প্রতিবন্ধী। অনেকে আবার একাধিক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বসবাস করে। পৃথিবীতে ৫০০ মিলিয়ন বা ৫০ কোটি লোক প্রতিবন্ধী। এদের মধ্যে বেশীরভাগ ৩০০ মিলিয়ন বা ৩০ কোটি বসবাস করে উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলোতে। এসব প্রতিবন্ধীদের ১৪০ মিলিয়ন বা ১৪ কোটি শিশু এবং ১৬০ মিলিয়ন বা ১৬ কোটি মহিলা।

১.২. এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের চিত্র

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের জনসংখ্যার এক দশমাংশ প্রতিবন্ধী। এদের সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন বা ৩০ কোটি। এ জনসংখ্যার ৬০-৮০ ভাগ পল্লী এলাকায় বসবাস করে। এ অঞ্চলের প্রতিবন্ধীদের অবস্থা একরকম নয়। একে অপরের থেকে আলাদা। এ ভিন্নতাও বিভিন্ন কারণে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাংস্কৃতিক অবস্থা, বয়স, সামাজিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি অধিকার এবং এদের প্রতিবন্ধিতার ধরনও আলাদা। এশিয়া প্যাসিফিক এলাকার প্রতিবন্ধীদের জন্য দশক (১৯৯৩-২০০২) ঘোষণা করা হয়েছে। আশির দশকের পূর্ব পর্যন্ত এশিয়ার অনেক দেশেই প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে কোন সচেতনতাই সৃষ্টি হয়নি। এরা সমাজে অদৃশ্য জনসংখ্যা ছিল।

১.৩. বাংলাদেশের চিত্র

বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ জনবহুল একটি উন্নয়নশীল দেশ। মাথাপিছু গড় আয় ৩৫০ মার্কিন ডলার এবং প্রতিবছর মাথাপিছু স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় ২·৫০ মার্কিন ডলার। দেশকে দারিদ্রমুক্ত এবং যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান দেশের জন্য

একটি চ্যালেঞ্জ। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশ পৃথিবীর ১৪৩তম দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে (২০০১ এর হিসাব মতে)। এ পরিমাপ করা হয়েছে গড় আয়ু, গড় আয়, গড় ক্যালোরি গ্রহণ, উচ্চ শিশু মৃত্যু হার, নিু শিক্ষার হার ইত্যাদির ভিত্তিতে। এ হল সমগ্র জনসংখ্যার সামগ্রিক বাস্তব চিত্র। সমগ্র জনসংখ্যার তুলনায় প্রতিবন্ধী মানুষের সামগ্রিক অবস্থা এমন একটি অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় আরো ভয়াবহ হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রতিবন্ধীরা যে উন্নয়নের অংশ তা সামগ্রিকভাবে সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত। উন্নয়নশীল দেশে প্রতিবন্ধীদেরকে লুকিয়ে রাখা হয়। তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে রাখার মানসেই তা করা হয়ে থাকে। এ লুকানোর প্রবণতা প্রমাণ করে যে, প্রতিবন্ধীরা সমাজের কোন উৎপাদনমুখী কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেনা এবং অন্যদিকে ধারণা করা হয়, সমাজকে তাদের জন্য উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছে। অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, প্রতিবন্ধীদেরকে কোন প্রকারেই বিচ্ছিন্ন করে রাখা ঠিক নয়, বরং মানসিকতার পরিবর্তন আনয়নে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা নিরূপণের সঠিক কোন তথ্য নেই। বিভিন্ন সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করছে। বাংলাদেশ সরকারের ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স ১৯৮২ এবং ১৯৯১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ০·৫২ ভাগ এক বা একাধিক প্রতিবন্ধির শিকার বলে উল্লেখ করেছে । বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবের তুলনায় এ সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কিন্তু বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের সাহায্যে যে সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে তা বাংলাদেশ ব্যুরো অব্ স্ট্যাটিসটিক্সের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। এ্যাকশন এইড এবং সারপভ্ বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮·৮ ভাগ বলে উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি (BPKS) এ সংখ্যা ৭·৮ ভাগ বলে উল্লেখ করেছে। ১৯৯৫ সালে ব্রিটিশ সরকারের ওভারসীজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন-এর এইড ম্যানেজমেন্ট অফিসের ডঃ জুলিয়ান ফ্যানসিজ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৯ মিলিয়ন বা ৯০ লাখ প্রতিবন্ধী রয়েছে এবং এর সিংহভাগ অর্থাৎ ৭ মিলিয়ন বা ৭০ লক্ষ বসবাস করে পল্লী অঞ্চলে।[৩] সেন্টার ফর সার্ভিসেস এবং ইনফরমেশন অন ডিসএ্যাবিলিটি কর্তৃক প্রকাশিত সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস অন ডিজাষ্টার এন্ড ডিসএ্যাবিলিটি ইস্যু ইন দি কোষ্টাল বেল্ট অব বাংলাদেশ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৯) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ২০ হাজার প্রতিবন্ধী রয়েছে, যারা বর্তমানে স্বল্প বা কোন প্রকার সাহায্যই পাচ্ছেনা। এদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬-৮ ভাগই শিশু। এসব প্রতিবন্ধীদেরকে পরিবার এবং কমিউনিটির উন্নয়ন কর্মসূচি

[3] Mohamed Farashuddin, Vice Chancellor, East-West University, The Integration of the Disabled as an Active Agent of Economic Growth, Second South Asian Conference on CBR Network, Dhaka, Bangladesh 3-6 December 1997.

থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে সরকার এবং বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধীদের সঠিক অবস্থা ও ভূমিকা বাদ পড়েছে অথবা সঠিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেনি। এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিবন্ধীদের সার্বিক অবস্থার অনুধাবন এবং প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে দুর্যোগ মোকাবেলার সময় এর প্রভাব নির্ণয় করা।

১.৪. প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত কিছু গবেষণা তথ্য

এ কে এম মোমিন, পরিচালক সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অব দি প্যারালাইজড, তার 'সাসটেইনিং সি বি আর ইন দি কমিউনিটি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কমিউনিটির সব সদস্যদেরকে সেবা দিতে সক্ষম নয়, এজন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে কমিউনিটিভিত্তিক সেবা প্রদানকে তিনি অংশগ্রহণমূলক ও মূল্য সাশ্রয়ী বলে উল্লেখ করেন।

অন্য একটি প্রবন্ধ 'দি ইন্টিগ্রেশন অব দি ডিসএ্যাবলড এ্যান্ড এ্যান একটিভ এজেন্ট অব্ ইকোনোমিক গ্রোথ'-এ তিনি প্রতিবন্ধী সমস্যাকে উন্নয়ন সমস্যার অংশ হিসেবে দেখার উপর গুরুত্বারোপ করে কতিপয় সুপারিশ পেশ করেন। প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে তিনি একটি মানবিক সমস্যা বলে উল্লেখ করেন এবং এ সমস্যা নিরসনকল্পে সহজ, বাস্তবসম্মত এবং মূল্য সাশ্রয়ী পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করতে হবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। ড. জুলিয়ান ফ্যান্সিস এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিবন্ধীরা নিজেদেরকে প্রতিবন্ধী মনে করে না - যদি তাদের জন্য পূর্ণ সময়কালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়। সুতরাং প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা বাড়িয়ে তাদেরকে পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের মানবিক মূল্যবোধ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি টেকসই উন্নয়নমুখী কার্যক্রম গড়ে তুলতে হলে সমগ্র দেশব্যাপী আদমশুমারীর মাধ্যমে (ক) প্রতিবন্ধীদের সঠিক সমস্যা নিরূপণ করতে হবে (খ) প্রতিবন্ধীদেরকে তাদের কর্মদক্ষতা অনুযায়ী বিভক্ত করতে তা সহজ হবে; একটি বেসরকারি এবং সরকারি সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে কমিউনিটি বেইজড্ রিহেবিলিটেশনের ধরন, অর্থ এবং কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে প্রতিবন্ধীদের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

অন্য 'লোকস্ট মডেলস অব কমিউনিটি-বেইজড রিহেবিলেটেশন ফর দি ডিসএ্যাবল ইন ডেভেলপ কান্ট্রিস' শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার সুলতানা সরোয়ার জামান উল্লেখ করেন যে, সরকারি নীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধীদের প্রাধান্য দেয়া হয় না এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী বিশেষজ্ঞগণ প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন আনতে আগ্রহী

নন। তিনি তার প্রবন্ধে দেশী এবং বিদেশী সকল কমিউনিটি বেইজড রিহেবিলিটেশন কার্যক্রমের কথা বলেছেন। তিনি মেক্সিকোর প্রোজিমো কার্যক্রম, যেখানে শতশত প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে তা মডেল হিসেবে গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেছেন। এ প্রকল্পটির কার্যক্রম স্থানীয় প্রতিবন্ধীদের মাধ্যমে চালানো হয়, পেশাদারদের মাধ্যমে নয়। সেবা প্রদানকারী এবং সেবাগ্রহণকারীর মধ্যে সমতার মনোভাব বজায় রাখার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা, স্বল্প আয় এবং তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম বিস্তারের মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

জিমকেয়ার জিমবাব্বের আর একটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি অভিনব শিক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে। হোম-বেইজড্ এডুকেশন প্রোগ্রাম এবং বইপত্র ও ভিডিও'র মাধ্যমে ষ্টাফ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে হোম বেইজড এডুকেশন সেবার চেয়েও বেশী কিছু এবং সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছে। এখানে গায়ানায় হোম ট্রেনিং, হোম সেন্টার বেইজড্ আরলি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম চন্ডিগড়, ভারত এবং জ্যামাইকার কার্যক্রমের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এখানে লেখক অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের গৃহীত ডিসট্যান্স ট্রেনিং প্যাকেজ প্রোগ্রামের উল্লেখ করেছেন এবং এ কার্যক্রমকে তিনি অভিনব বলে উল্লেখ করেছেন।

১৯৮৬ সালে এ কার্যক্রম বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নেয়া হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব প্রতিবন্ধী বসবাস করে এবং বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহণে তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ঐসব প্রতিবন্ধী পরিবারকে সাহায্য করা- কেমন করে প্রতিবন্ধীদের ভাষা আয়ত্ত করাবে, মানসিক বুদ্ধি বিকাশে সহায়তা ও সামাজিকীকরণ, প্রাত্যাহিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ যেমন-খাওয়ানো, কাপড়-চোপড় পড়ানো, পায়খানা-প্রস্রাব করণে সহায়তা প্রদান এবং কিভাবে কমিউনিটিতে বসবাস করতে হয় সে সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের ছাপানো ছবি সম্বলিত পুস্তিকার মাধ্যমে এ ডিসট্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ কার্যক্রমকে কার্যকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের আর একটি কেন্দ্র ধামরাইয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদেরকে প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। একেন্দ্র মায়েদেরকেও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন 'আর্লি ইন্টারভেনশন প্রোগ্রাম থ্রু সিবিআর' ৪টি গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি জরিপ পরিচালনা করেছে। এ জরিপ পরিচালনা করেছে প্রশিক্ষিত কমিউনিটি কর্মীরা, খানা বা হাউজহোল্ড ফরম, মা ও

শিশু ফরম এবং ১০টি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল ২ থেকে ৯ বছর বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে প্রতিবন্ধীদেরকে চিহ্নিত করা এবং ১৭৫৩ জন শিশুর মধ্যে মোট ৩৪ জনকে প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এসব চিহ্নিত শিশুদেরকে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করানো হয়েছিল এবং যেসব শিশুদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল তাদেরকে 'দূর শিক্ষণের' প্যাকেজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে রুমিজউদ্দিন আহম্মেদ কমিউনিটি-বেইজড্ প্রোগ্রাম এবং সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব্ দি মেন্টালি রিটারডেট, বাংলাদেশ এর মডেলে অলটারনেটিভ স্কুল-বেইজড প্রোগ্রাম চালুর কথা বলেছেন। এ সংস্থার ৩৬টি কেন্দ্রের ১৭টিতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে এবং এ কেন্দ্রগুলোতে ৮৭৬ জন শিশু অংশগ্রহণ করেছে। ড. মো. ফজলুল হক এবং মারগারিটা এন্টোনিয়ারেস 'কমিউনিটি বেইজড রিহেবিলিটেশন (VBR) ওয়ার্ক থ্রু মোবাইল ক্লিনিক সার্ভিসেস' প্রবন্ধে বলেছেন যে, বিভিন্ন থানায় সংগঠিত ১০টি মোবাইল ক্লিনিকে ১৩০৯ জন রোগী এসেছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগেরই কোন-না-কোন প্রতিবন্ধিতা ছিল। প্রবন্ধকারদ্বয় প্রতিবন্ধিতার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন-কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ শতকরা ৪৫ ভাগ, সেরিব্রাল প্যালাসি (CP) শতকরা ২০ ভাগ, পোলিও মাইলাটিস শতকরা ৭ ভাগ, আর্থাইটিশ শতকরা ৬ ভাগ, পৃষ্ঠের ব্যথা ৩ ভাগ এবং অন্যান্য শতকরা ২৯ ভাগ। মোবাইল ক্লিনিকে আগতদের মধ্যে বেশীর ভাগ শিশু (২৫০) এবং পরবর্তী যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে ৪০-৪৯ বৎসর বয়সের ছিল ২৩০ জন।

'রোল অব্ এনজিও ইন দি ডেভেলপমেন্ট অব্ সিবিআর' প্রবন্ধে মো. আরিফ এবং মো. গোলাম রসুল আরমান মূলত: বেসরকারি সংস্থার করণীয় যেমন সচেতনা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধিতা নিরসনকল্পে গৃহীত ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা কার্যক্রম, আয়মূলক কর্মসংস্থান, প্রতিষ্ঠান গঠন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, কারিগরী সহায়তা দান এবং কার্যকর রেফারেন্স ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

খন্দকার জহুরুল আলম 'রোল এন্ড কো-অপারেশন অব্ গভ: এন্ড এনজিওস ইন সিবিআর' প্রবন্ধে সরকারি নীতি নির্ধারণে এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করেছেন। 'ডেভেলপিং গভ: এনজিও কো-অপারেশন ইন সিবিআর' প্রবন্ধে মো. মাহবুবুল আশরাফ বলেছেন যে, 'সরকারি সহায়তা মূলত: আইনগত এবং কারিগরী সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে'। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় এবং

সহযোগিতার ধরন, দাতা এবং সরকারি আইন ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণী আলোচনা রয়েছে। যেসব বিষয় বেসরকারি সংস্থাকে প্রভাবিত করে ইত্যাদি অনুধাবনের জন্য ভলান্টারি হেলথ সার্ভিসেস সোসাইটি ১৯৯৬ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিল। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, যদি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো তাদের ভূমিকা ও সহযোগিতার ধরন পরিবর্তন না করে তাহলে আগামী ২৫ বছরেও দেশের সমগ্র প্রতিবন্ধীদের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে না। প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন যে, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের সেবার নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে।

মি. মনসুর আহম্মেদ চৌধুরী, ফারহানা রহমান, মি. গাইলে ফানু-'দি এমপাওয়ারমেন্ট অব্ পিপলস উইথ ডিসএ্যাবিলিটি ইন কমিউনিটি বেইজ্ড রিহেবিলিটেশন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়নে কতগুলো বাধার কথা বলেছেন। এগুলো হচ্ছে, প্রথমত: প্রতিবন্ধীদের মানুষের প্রতি বিরূপ মনোভাব যা পরিবারেই প্রথম শুরু হয়। পরিবার প্রতিবন্ধীদের লুকিয়ে রাখে এবং তাদেরকে পরিবারের আপদ বা বোঝা মনে করে। ক্রমান্বয়ে এ মনোভাব প্রতিবেশীদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। দ্বিতীয়ত: প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বঞ্চিত, তৃতীয়ত: তারা তথ্যপ্রবাহ থেকেও বঞ্চিত, চতুর্থত: সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রবন্ধকারগণ এসব বাধা অতিক্রম করার জন্য প্রথমে মনোভাব পরিবর্তন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, তথ্য দেয়া এবং সম্পদের প্রতি অধিকার বা সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এ বাধা অতিক্রম করে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন করা সম্ভব বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

'প্যারেন্টস ইনভল্ভমেন্ট ইন দি আর্লি ইন্টারভেশন প্রোগাম, পেডিয়াট্রিক অডিওলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট ফ্যাসিলিটিজ ইন বাংলাদেশ', 'এডুকেশন ফর চিলড্রেন উইথ ডিসএ্যাবিলিটি ইন অরডিনারী স্কুল' প্রভৃতি প্রবন্ধেও বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের অবস্থার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

নায়লা জেড খান এবং আকলিমা বেগম 'ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস ইন এ্যান আরবান কমিউনিটি ইন ঢাকা সিটি' গবেষণায় ২ থেকে ৯ বৎসর বয়সের বাচ্চাদের মধ্যে ১০টি প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মোট ২ হাজার শিশুর উপর জরিপ চালিয়ে দেখেছেন যে, এদের মধ্যে শতকরা ১৩ ভাগ ১০টি প্রশ্নে পজেটিভ অর্থাৎ প্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এদের মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগের ক্ষেত্রে কোন-না-কোন প্রকার প্রতিবন্ধিত্ব পরিলক্ষিত হয়েছে। চরম প্রতিবন্ধী শতকরা ৬ ভাগ। শতকরা ৫০ ভাগের অবশ্য এক বছরের মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র (সিআরপি) 'ঢাকা থেকে মেরুরজ্জুর আঘাত নিয়ে বসবাস' গ্রন্থে পক্ষঘাতগ্রস্থদের জন্য অনেক জরুরী তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আঘাতের লক্ষণসমূহ, বাংলাদেশে মেরুরজ্জুর আঘাতের কারণসমূহ এবং আঘাতবিহীন (বিভিন্ন রোগের কারণে) পক্ষঘাতে আক্রান্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। কেন্দ্র হুইল চেয়ার তৈরি, তার ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ, মূত্রথলির নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক কার্যাদির ব্যবস্থাপনা, ত্বকের যত্ন, পুষ্টি, মেরুরজ্জুতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আবেগ ও অনুভূতি, যৌনজীবন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এটি একটি শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয় পুস্তিকা যা প্রতিবন্ধীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে সক্ষম।

'সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিসএ্যাবলিটি আনভেইলিং ডার্কনেস: সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস অন ডিজাষ্টার এন্ড ডিসএ্যাবলিটি ইস্যুস ইন দি কোষ্টাল বেল্ট অব্ বাংলাদেশ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৯)' শীর্ষক জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, স্থানীয় লোকজন প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে কি ভাবেন, প্রতিবন্ধীদের আর্থসামাজিক অবস্থা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে, দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ পরবর্তী প্রতিবন্ধীদের অবস্থা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, প্রতিবন্ধীদের পুরুষ-নারী অনুপাত ৬৩%-৩৭% ভাগ। এদের মধ্যে শতকরা ৫৩ জন ০-২০ বছর বয়সসীমার মধ্যে, সাক্ষাৎকার দানকারী শতকরা ৫৬ জনই শারীরিক প্রতিবন্ধী; শতকরা ৪৬ ভাগ নানা রোগের কারণে প্রতিবন্ধী হয়েছে। শতকরা ৩৮ ভাগ জন্মের সময়কার অসুবিধাজনিত কারণে প্রতিবন্ধিত্বের শিকার। সাক্ষাৎকার দানকারী শতকরা ৭৬ ভাগ প্রতিবন্ধীর কোন শিক্ষা নেই। কেবলমাত্র শতকরা ১ ভাগের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে, ১৫ বৎসরের উর্দ্ধে বয়স এমন শতকরা ৪৫ ভাগই বেকার, উত্তরদাতাদের শতকরা ১৩ ভাগ ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৫৩ ভাগ পারিবারের জন্য কিছু-না-কিছু উপার্জনে সক্ষম, শতকরা ৫০ ভাগেরই পরিবারে ৭ জন অথবা তার বেশী সদস্য রয়েছে; শতকরা ৮৭ জনের ঘর বাঁশের তৈরি এবং কেবলমাত্র শতকরা ১৭ ভাগের টিনের ঘর রয়েছে। শতকরা ৯২ ভাগ পরিবারের প্রধান পুরুষ, শতকরা ১০০ ভাগ উত্তরদাতাই জীবনে কখনও-না-কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে। শতকরা ১৭ ভাগকে দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং প্রায় শতকরা ২০ ভাগকে স্থানীয় লোকজনই সাহায্য করেছে; শতকরা ৪৯ জন প্রতিবন্ধী বলেছেন যে, কমিউনিটির লোকজনের সহানুভূতি রয়েছে তাদের জন্য; শতকরা ৮০ ভাগ প্রতিবন্ধী পরিবার সাহায্য পেয়েছে, মাত্র শতকরা ২ ভাগ পরিবার প্রতিবন্ধী থাকার কারণে দুর্যোগ-পরবর্তী সাহায্য পেয়েছে এবং শতকরা ২৮ ভাগ প্রতিবন্ধী আয়মূলক কর্মসংস্থানের জন্য সাহায্য পেয়েছেন।

'সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন্ ডিসএ্যাবিলিটি এর সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস এন্ড নীড এ্যাসেসমেন্ট উইথ্ ডিসএ্যাবিলিটিস ইন ঢাকা সিটি (ডিসেম্বর ১৯৯৯)' একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল-প্রতিবন্ধী শিশু, যারা রাস্তায় বসবাস করে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার অনুধাবন এবং কি কি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসব শিশুদের উন্নয়ন করা সম্ভব তা খতিয়ে দেখা। জরিপের ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শারীরিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা শতকরা ৫১.৭৬ ভাগ, বাক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীর সংখ্যা শতকরা ৯.১৭ ভাগ এবং একাধিকভাবে প্রতিবন্ধী শতকরা ৪.১৭ ভাগ। এদের মধ্যে ০-৫ বছর বয়স সীমার মধ্যে রয়েছে শতকরা ১.৬৭ ভাগ, ৬-১০ বছর বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে শতকরা ৩৮.৩৩ ভাগ, ১১-১৫ বছর বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে শতকরা ৫৩.৩৩ ভাগ এবং ১৬ এবং তদুর্ধে শতকরা ৬.৬৭ ভাগ। এসব বাচ্চাদের বেশীরভাগই বাড়িতে অবহেলিত এবং সমসুযোগ থেকে বঞ্চিত। পরিবার তাদেরকে বোঝা মনে করে। অনেক পরিবারই প্রতিবন্ধিতাকে ভাগ্য এবং নিয়তির পরিহাস বলে মনে করে। অনেকেই তাদেরকে পারিবারিক এবং সামাজিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। অনেক সময় তাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা প্রতিবন্ধী সন্তানকে লাভজনক ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। দেখা গেছে যে, পরিবারে মা এবং বোনই এসব প্রতিবন্ধীদের বেশী যত্ন করে। তাদেরকে সামাজিক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখা হয়, বেশীর ভাগকেই প্রচলিত মজুরী বা অন্যান্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিবারের সদস্যরা সাধারণত মেডিকেল কেয়ার নিয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে তেমন কোন পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নেয়া হয়নি এবং উন্নয়নের জন্যও সীমিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এদের শতকরা ৬৩.৩০ ভাগেরই কোন শিক্ষা নেই। এসব প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৪৬.৬৭ ভাগই ভিক্ষুক, শতকরা ৪৩.৩৩ ভাগের ক্ষেত্রে কোন পেশারই উল্লেখ নেই। আবার ৪৩.৩৩ ভাগ কোন আয়ই করেনা, ৫০০-১০০০ টাকা আয় করে শতকরা ১৫ ভাগ প্রতিবন্ধী, শতকরা ১১ ভাগ আয় করে ১০০১-২০০০ টাকা এবং অন্য শতকরা ১১ ভাগের আয় ২০০০ টাকার উর্দ্ধে। দক্ষতার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শতকরা ৫৩.৩৩ ভাগের ক্ষেত্রে দক্ষতার কোন উল্লেখ নেই। শতকরা ৪.১৭ ভাগ হস্ত-শিল্প, শতকরা ৫.৮৩ ভাগ মেকানিক্স, ১১.৬৭ ভাগ দোকানে কাজ করে। সমাজের অনেকেই প্রতিবন্ধীদেরকে 'ঐশ্বরিক শাস্তি' এবং সমাজের জন্য বোঝা, তারা অসহায় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক বলে মনে করেন।

১.৫. প্রতিবন্ধিতার কারণ: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

প্রতিবন্ধিতার অনেক কারণ রয়েছে। অনেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে আবার অনেকে পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধী হয়। এশিয়া প্যাসিফিকভুক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবন্ধিতার কারন বহুমুখী। প্রধান প্রধান কারণগুলো হলো অপুষ্টি, সংক্রামক রোগ, গর্ভবতী অবস্থায় পর্যাপ্ত সেবার অভাব বা খুব নিম্মানের সেবাগ্রহণ, দুর্ঘটনা এবং আক্রমণ বা সহিংসতা। প্রতিবন্ধিতার শতকরা ৭০ ভাগই এ কারণগুলোর জন্য ঘটে থাকে।

এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের শতকরা ৪০ ভাগ শিশু প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। এ অঞ্চলের গর্ভবতী মহিলারা খুব নিম্মানের গর্ভকালীন সেবা বা সেবা না পাবার কারণে প্রতিবন্ধী হয়। হাম, বিষক্রিয়া, ম্যানেনজাইটিস, এ্যানসেপাহাইলাটিস, চক্ষু এবং কানের প্রদাহ, ট্রমা, কুষ্ঠ ইত্যাদি এবং কিছু কিছু যৌনবাহিত রোগ যা গর্ভবতী মহিলাদের মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তানের দেহে সংক্রামক হয়েও প্রতিবন্ধিতার সৃষ্টি করে।

আমাদের মত অনেক উন্নয়নশীল দেশে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকেই ঔষধ সেবন করা হয়। অনেক সময় গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে যে ঔষধ গর্ভাবস্থায় সেবনযোগ্য নয়, তা সেবনের মাধ্যমে গর্ভস্থ ভ্রুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হতে পারে। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাসে ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে ঔষধ সেবন না করাই শ্রেয়। গর্ভাবস্থায় এ বিধি মেনে চলা খুবই জরুরী। বিভিন্ন ব্রান্ডের এ্যাসপিরিন যা বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলো গর্ভবতী মহিলারা অধিকমাত্রায় সেবন করলে মৃত সন্তান প্রসব বা কম ওজনের শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ ঔষধ গর্ভাবস্থার শেষদিকে গ্রহণ করলে গর্ভস্থ শিশুর অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হতে পারে। এমন কতগুলো ইনজেকট্যাবল জন্মনিরোধক রয়েছে, যার ব্যবহার উন্নত দেশগুলোতে অনেক আগেই বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এশীয় অঞ্চলের অনেক দেশে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। যদি গর্ভাবস্থায় এগুলো ভুলক্রমে দেয়া হয় তাহলে ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম হতে পারে। গর্ভাবস্থায় এ্যালকোহলের ব্যবহারেও ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম হতে পারে। নারকোটিকস এবং কোকেনের ব্যবহারের ফলে কম ওজনের শিশুর জন্ম হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ভিটামিন সি (প্রতিদিন ১ গ্রামের বেশী) ভিটামিন এ ও ডি এবং কে-এর বেশী ব্যবহার গর্ভস্থ ভ্রুণের জন্য ক্ষতিকর। অনেক সময় দেখা যায় গর্ভাবস্থায় কোন মা যদি গুরুতর বহুমূত্র রোগে ভোগেন অথবা হৃদপিন্ডের অসুখে ভোগেন তাহলে তার গর্ভস্থ সন্তান মানসিক প্রতিবন্ধী অথবা অন্যভাবে প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্ম নিতে পারে। জেনেটিক অথবা ক্রোমোজমের অস্বাভাবিকতার কারণেও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হতে পারে। গর্ভাবস্থায় যদি পুরানো এক্সরে মেশিনে এক্সরে করা হয় তাহলে অঙ্গবিকৃতি এবং গর্ভাবস্থার যে কোন সময় এক্সরে করালে তাতে নবজাতকের ক্যান্সার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

জীবনের যে কোন সময়েই যে কেউ প্রতিবন্ধিতার শিকার হতে পারে। যেমন, সংক্রামক ব্যাধি ম্যালেরিয়া, এনসেফালাইটিস, ম্যানেনজাইটিস, ডিপথেরিয়া, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগগুলো সাধারণত নিম্মানের জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত এবং এ রোগগুলোর কারণে জীবনের যে কোন সময়েই যে কেউ প্রতিবন্ধী হতে পারে।

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পানীয় জলের অভাব, আবর্জনা এবং পয়নিষ্কাশনের অভাব এমন রোগের জন্ম দিতে পারে যা কোন কোন কমিউনিটির লোকজনকে প্রতিবন্ধী করতে পারে। প্রতি বছর অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব, ভিটামিন-এ এর অভাবে বাংলাদেশে ত্রিশ হাজার শিশু অন্ধ হয়। অনেক সময় অপরিকল্পিত উপায়ে শিল্পায়ন, রাসায়নিক বর্জ্য, আর্সেনিক, টক্সিক ড্যাম্প, পরমাণু বিকিরণ, মার্কারী এবং অন্যান্য পরিবেশ দূষণকারী পদার্থের কারণে প্রতিবন্ধী হতে পারে। অনেক সময় কীট-পতঙ্গ বিধ্বংসী রাসায়নিক পদার্থ-ক্যান্সার, গর্ভপাত এবং অঙ্গবিকৃতি ঘটাতে সক্ষম। পৃথিবীতে বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত বা ব্যবহার্য ২ লক্ষ্য কেমিক্যালের ২ ভাগ পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর মাত্র ২৬টিতেই মানবদেহের জন্য ক্যান্সারের আলামত পাওয়া গেছে।

দুর্ঘটনা প্রতিবন্ধিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ। এ দুর্ঘটনা হতে পারে বাড়ীতে, রাস্তায়, কর্মস্থলে, পারমাণবিক চুল্লীতে এবং কলকারখানা বা ফ্যাক্টরীতে। এছাড়া, যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অদক্ষতা, আগে কখনও যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে আসেনি বা প্রশিক্ষণ পায়নি বা পেশাগত নিরাপত্তার অভাব; উচ্চপর্যায়ের যন্ত্রপাতির ভুল ব্যবহার যেমন লেসার রশ্মি ইত্যাদির ভুল ব্যবহারের কারণেও প্রতিবন্ধী হতে পারে। কমিউনিটি-বেইজড রিহ্যাবিলিটেশন (সিবিআর) ওয়ার্ক থ্রু মোবাইল ক্লিনিক সার্ভিসেস শীর্ষক প্রবন্ধে পৃষ্ঠে ব্যথা, পোলিও মাইলাইটিস, আর্থাইটিস, সেরেব্রাল প্যালাসি, কার্ডিওভাসকুলার ডিজিস ইত্যাদি সমস্যা প্রতিবন্ধিতার কারণ বলে উল্লেখিত হয়েছে। মেন্টাল রিটারডেশন - বাংলাদেশ পারসপেকটিভ্ শীর্ষক প্রবন্ধে যেসব কারণে সাধারণত প্রতিবন্ধিত্ব হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণগুলো হল-তীব্রজ্বর, প্রচন্ড ডায়রিয়া, পান্ডুরোগ, ইপিলেপসি, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, মেনেনজাইটিস, ব্লাড ডিসেন্ট্রি, ব্রেইন টিউমার এবং শ্বাসকষ্ট।[4]

একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৩ বৎসর বয়সের পরই সাধারণত শতকরা ৮৫ ভাগ প্রতিবন্ধী হয় এবং শতকরা ৯০ ভাগ শিশু প্রতিবন্ধী হয় সামাজিক যেমন-অসুস্থতা বা দারিদ্র, বংশগত বা জেনেটিক কারণে। পৃথিবীর প্রতি ৫ জন

[4] Rowshon Ara Rani, Mental Retardation: Bangladesh Perspective.

প্রতিবন্ধীর একজন হয় অপুষ্টিজনিত কারণে। এরপরও রয়েছে শারীরিক আঘাত, দুর্ঘটনা, পরিবেশ দূষণ, অত্যধিক মানসিক চাপ এবং অতিরিক্ত শাস্তি।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবন্ধিতার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- যুদ্ধ এবং যুদ্ধের পরিণতি;
- অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার যারা জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে;
- শিক্ষাবঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠী, যারা সামাজিক সেবাসমূহ এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত;
- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব, এর কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা;
- অপর্যাপ্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা;
- ভৌগোলিক দূরত্ব, শারীরিক ও অন্যান্য সামাজিক বাধা যা অতিক্রম করে অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে সেবা নেয়া সম্ভব হয়না;
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার বা সাহায্য করার জন্য যথাযথ অবকাঠামো অথবা অবকাঠামোর অপ্রতুলতা;
- প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার প্রতি অগ্রাধিকার না দেয়া;
- শিল্প, কৃষি এবং যানবাহন সম্পর্কিত দুর্ঘটনা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভূমিকম্প;
- পরিবেশ দূষণ;
- প্রথাগত সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের ফলে সৃষ্ট মনো-সামাজিক চাপ;
- ঔষধের যথেচ্ছ ব্যবহার, থেরাপির জন্য ব্যবহার্য ঔষধপত্র, ঔষধের ব্যবহার;
- আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসাও প্রতিবন্ধিত্বের কারণ;
- নগরায়ন এবং পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি ।

বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের যেসব উপায়সমূহের কথা বলেছেন, তার সারমর্ম নিম্নরূপ:

- যুদ্ধ পরিহার;
- সমাজের সবচেয়ে ভাগ্যাহত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন;
- ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরন ও কারণ নির্ণয় করা;
- পুষ্টিবিষয়ক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ;
- স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন;
- প্রাথমিক অবস্থায় প্রতিবন্ধিতার ধরন চিহ্নিতকরণ এবং রোগ নির্ণয় করা;
- গর্ভকালীন এবং গর্ভত্তোর যথাযথ পরিচর্যা;
- যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সচেতনতা;

- পরিবার পরিকল্পনা;
- আইন এবং নিয়ন্ত্রণ;
- জীবনযাপনের মানোনোন্নয়ন;
- বিশেষ সেবা আইন;
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত শিক্ষা; এবং
- পারিবারিক ও কমিউনিটি পর্যায়ে পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ়করণ।

১.৬. প্রতিবন্ধী এবং মানবাধিকার

প্রতিবন্ধী সমস্যাকে উন্নয়ন সমস্যা বা মানবিক সমস্যা হিসেবে এখনও অনেক সমাজে বিবেচনা করা হয় না। যদিও জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবন্ধী দশক ঘোষিত হয়েছে এবং বিষয়টি একটি মানবিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তথাপিও উন্নয়নশীল অনেক দেশ এবং সমাজ এ সমস্যাকে এখনও মানবিক সমস্যা হিসেবে দেখে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করায় বিষয়টি মানবিক ও আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে ঘটেছে অভূতপূর্ব বিপ্লব এবং তা অবাধ হবার কারণে এখন উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমের তথ্য প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত উন্নত দেশের চিন্তা-চেতনা আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে। আমাদের নির্লিপ্ততার পেছনে গোটা সমাজের দারিদ্র পরিস্থিতি কাজ করেছে। তথ্যপ্রবাহের এ যুগে এসে নবশক্তি সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের চেতনায়।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রতিক সময়ের ভাবনা এবং অতীতের ইতিহাস আমাদেরকে বলে যে,

কার্লব্রাউটকে যখন নূরেমবার্গে যুদ্ধ অপরাধী ট্রাইবুনালে ২০ হাজার শিশু এবং পূর্ণ বয়স্ক-শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীকে হত্যার দায়ে বিচার করা হয়েছিল তখন তিনি নিজেকে এ বলে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল যে, Out of pity for the victim and out of a desire to free the family and loved ones from a lifetime of needless sacrifice। তিনি ১৯৩৯-৪১ সনের মধ্যে যে ২ লক্ষ প্রতিবন্ধীদের হত্যা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে Lives Unworthy of Life বলে অভিহিত করেছিলেন। শিশুদেরকে অনাহারে এবং বয়স্কদেরকে গ্যাসচেম্বারে মেরেছিলেন। Euthanasia Programme-এর উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে-শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না; নাৎসী জার্মানীর এ হত্যাকারীরা বিশ্বাস করত যে প্রতিবন্ধীরা সমাজের কোন উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং সমাজের জন্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এ অপধারণার বশবর্তী হয়েই তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল।

চীনের কোন কোন অংশে প্রতিবন্ধীকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও দেখা হয় না। চীনের কিছু কিছু জেলায় এখনও প্রতিবন্ধীদের বিবাহ অনুমোদন করে না যতক্ষণ পর্যন্ত না বিবাহেচ্ছুদের একজন বন্ধ্যাকরণ না করেন। এভাবে গুয়াংসু জেলায় ৫ হাজার জন বন্ধ্যাকরণ করেছিলেন। সিচুয়ান জেলার সরকারি ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, যেসব দম্পত্তির বংশগত রোগ যেমন-মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধিতা রয়েছে, তাদের বাচ্চা নেয়া কোনমতেই অনুমোদন করা যাবে না। যখন কোন প্রতিবন্ধী মহিলা গর্ভবতী হয়, তখন তাকে জোর করে গর্ভপাত করানো হয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মহিলা বা পুরুষকে জোর করে বন্ধ্যাকরণের ঘটনা অনেক সমাজেই ঘটে থাকে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী কোন নারীর 'মাসিকের বিড়ম্বনা'র দোহাই দিয়ে জরায়ু কেটে ফেলার মত ঘটনাও ঘটে।

মানবাধিকার নিয়ে যে দেশটি সবচেয়ে বেশী চিন্তিত, বা বিশ্বের অন্য কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হলে সবচেয়ে বেশী শোরগোল তোলে যে আমেরিকা, খোদ সে আমেরিকাতেই প্রতিবন্ধীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে রাষ্ট্র কর্তৃক দেয় সুযোগসুবিধাসমূহ বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সংকুচিত অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে তা বাতিল করা হয়। এ প্রসঙ্গে একজন ভুক্তভোগী আক্ষেপ করে বলেছেন যে, সমাজসেবা অধিদপ্তরের মতে, প্রতিবন্ধীদের ভালবাসায় পড়তে নেই, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে নেই এবং তাদের যৌন জীবন থাকতে নেই। ফলশ্রুতিতে আমরা হব জড় পদার্থ এবং কামশীতল।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোর বাস্তব প্রতিফলন কোন সমাজেই প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ঘটেনা। অনেক মানবিক অনুভূতি প্রকাশের সুযোগও সমাজ প্রতিবন্ধীদের জন্য অবরুদ্ধ। প্রতিবন্ধীদের এ মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলে তাদের দক্ষতা, আত্মমর্যাদা এবং আত্মসম্মানবোধ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। আর এ মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বহীন জীবনযাপন তাদেরকে হতাশার গভীরে ঠেলে দেয়।

১.৭. প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার এবং বাংলাদেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলোর অন্যতম। হিউম্যান ইনডেক্স ডেভেলপমেন্ট অনুসারে বাংলাদেশ পৃথিবীর ১৪৩তম দেশ (২০০১ এর হিসেব মতে)। চরম-দারিদ্র, অশিক্ষা, জনসংখ্যাধিক্যতা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা হল আমাদের আর্থ-সামাজিকতার নৈমিত্তিক। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি (২০০১ এর হিসেব মতে)। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম এ দেশটিতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮০০ জনের অধিক জনসংখ্যার বসবাস। দেশটি প্রধানত

কৃষিনির্ভর। দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ কর্মক্ষম জনবল এক্ষেত্রে কর্মরত। কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ বেকার। শতকরা ৮৫ ভাগ জনসাধারণ গ্রাম এলাকায় বসবাস করে এবং শতকরা ৪৮ ভাগ জনসংখ্যাই মহিলা। দেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৫০ ভাগেরই বয়স ২৫ বৎসরের নিচে। প্রতি হাজারে জীবিত শিশু জন্মে মাত্র ৭৭ জন। ১৯৮৫-৮৬ সনের এক জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে, শতকরা ৬০ ভাগ শিশুই প্রথম অথবা দ্বিতীয় গ্রেডের অপুষ্টিতে ভোগে। ডায়রিয়া, পোলিও, হুপিংকাশি, যক্ষ্মা, টিটেনাস, নিউমোনিয়া এবং মস্তিস্কের প্রদাহ ইত্যাদির কারণে প্রতিবছর অসংখ্য শিশু মারা যায় অথবা পঙ্গুত্ব বরণ করে। বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৫০ আমেরিকান ডলার (২০০১ এর হিসেবে) যা দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের যেকোন দেশের চেয়ে কম।

এত পশ্চাদপদ অর্থনীতির একটি দেশে এমনিতেই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছেনা বলেই মানবাধিকার অনেকাংশে লংঘিত। এত বড় পশ্চাদপদ অর্থনীতির একটি দেশে বিপুল জগগোষ্ঠী প্রতিবন্ধী, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ১ কোটি ৩০ লক্ষ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ১ কোটি ৩০ লক্ষের বেশী মানসিক রোগী আছে। অন্য এক হিসাবে দেখা গিয়েছে যে, এসব প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৭০ ভাগই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যাদের শিক্ষা রয়েছে, তা খুবই সামান্য। জীবন এবং জীবিকার জন্য এ শিক্ষা সামান্যই সহায়ক হতে পারে। প্রতি বছর প্রায় ২৫০ হাজার প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বাড়ে। প্রতিবৎসর এ দেশে ভিটামিন এ জনিত অভাবের কারণে ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হচ্ছে।

চরম-দারিদ্র, প্রসব-পূর্ব উন্নত সেবা চিহ্নিত করতে না পারা, অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সন্তান প্রসব, সংক্রমণ রোগ, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপুষ্টি, ভিটামিন-এ এর অভাব, পরিবেশ দূষণ ও বিপর্যয়, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন-এসব কারণগুলোই সাধারণত প্রতিবন্ধিতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। জাতিসংঘ কর্তৃক সনাক্তকৃত যেসব কারণের জন্য প্রতিবন্ধিতা দেখা দেয় বাংলাদেশে তার সবগুলোই বর্তমান। জাতিসংঘের অন্য এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৮০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এবং পল্লী এলাকায় বসবাস করে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রাপ্ত চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধা যা শহর এলাকায় কিছুটা পাওয়া যায়; সেসব সুযোগ-সুবিধা পলী এলাকায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়; এবং একই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিবন্ধীদেরকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়। জাতীয় সরকারগুলো প্রতিবন্ধী সমস্যাকে কখনও জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেনি। ফলশ্রুতিতে, প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার এসকল অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থায় চরমভাবে লংঘিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশের

মত কৃষিভিত্তিক একটি পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসকারী প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের মানধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে রয়েছে। কেননা যেখানে দেশের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী জনসংখ্যা দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে, সেখানে প্রতিবন্ধীদের অবস্থা যে শোচনীয় তা সহজেই অনুমেয়। মূলত প্রতিবন্ধিতা একদিকে পরিবারের দারিদ্র বাড়িয়ে তোলে, অন্যদিকে এদের চিকিৎসা ব্যয় এবং প্রতিবন্ধিতার কারণে তারা কোন উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত হতে পারে না।

প্রতিবন্ধী সমস্যা এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এ ভূখন্ডে প্রথম কাজ শুরু হয় ষাটের দশকে। কিন্তু বিষয়টির প্রতি নিবিড়-দৃষ্টি দেয়া হয় ১৯৭১ সনের পর যখন জাতিসংঘ কর্তৃক মানসিক প্রতিবন্ধীদের অধিকার ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রতিবন্ধী দশক এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশক এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি সত্তরের দশকের পর থেকেই একটি উন্নয়ন ও মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে পৃথিবীব্যাপি চিহ্নিত হতে শুরু করে ।

১৯৮৩ সন থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী দশক ঘোষণা করেছে। যখন জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত দশকের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে পরিলক্ষ্যিত হয়েছে যে, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এ দশকে যে অর্জন হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি।

এমতাবস্থায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোতে পুনরায় প্রতিবন্ধী দশক ঘোষণা করা হয় ১৯৯৩ থেকে ২০০২ সন পর্যন্ত। এশিয়া প্যাসিফিক ঘোষিত প্রতিবন্ধী দশকে বাংলাদেশও একটি স্বাক্ষরকারী দেশ। এ দশক কর্তৃক ঘোষিত কার্যক্রমে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়নেও অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিউনিটি-নির্ভর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উপর বাংলাদেশেই দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ইউনেস্কোর হিসেব মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মাত্র শতকরা ১ ভাগ প্রতিবন্ধী তাদের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে তা ভোগ করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ, দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব রয়েছে। প্রতিটি সমাজের এবং রাষ্ট্রেরই প্রতিবন্ধী সমস্যা রয়েছে। সাধারণত: প্রতিবন্ধীদেরকে প্রতি সমাজেই হেয় করে দেখানো হয়। প্রতিবন্ধীদেরকে অনেক সময় পিতা-মাতা বা প্রতিবন্ধীর নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা

পাপের ফল বলে ধারণা করা হয়। আমাদের সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীকে সরাসরি পাপের পরিণাম বলে মনে করা হয়। অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা প্রতিবন্ধীদের সারিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবেশীরা প্রতিবন্ধীদের প্রতি অমানবিক আচরণ করে। ফলশ্রুতিতে, প্রতিবন্ধীরা স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন অথবা কোন প্রকার পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়না। আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী হ'তে যে মানসিক শক্তি বা আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন তাদের গড়ে ওঠেনি; তারা যে পরিবেশে বসবাস করে সে পরিবেশ আত্মবিশ্বাসী হ'তে সহায়ক নয়; তারা ভাবতে শেখে যে, আমৃত্যু তারা পরিবারের বোঝা। জীবনের শুরুতেই তারা ভাবতে থাকে যে, জীবনে তারা বঞ্চিত এবং কখনই স্বাবলম্বী হতে পারবে না। প্রতিবেশীদের রূঢ় আচরণ তাদেরকে আরও বেশী নিরাপত্তাহীন করে তোলে এবং তারা আরও বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের সমাজ যেখানে সামগ্রিকভাবে অপ্রতিবন্ধী মহিলাদের অবস্থা খুব একটা সন্তোষজনক নয়, সেখানে তারা অশিক্ষা, অর্থনৈতিক ও শারীরিক ও পারিবারিক অনিরাপত্তায় ভোগেন, সেক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থা আরো শোচনীয় এবং করুণ। প্রতিবন্ধিতা নারীদের জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে- মেয়েদের বিবাহের সম্ভাবনাকে রহিত করে; অথবা অত্যধিক যৌতুকের মাধ্যমে বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয় অথবা এমন একজন বর খুঁজে বের করতে হয় যার বিয়ে করার সম্ভাবনা ও যোগ্যতা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে সাধারণত বর হয় বৃদ্ধ, উন্মাদ, চির-জরাগ্রস্ত অথবা একাধিক স্ত্রী রয়েছে এমন। প্রতিবন্ধীরা পরিবারের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করলেও তাদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন পরিবারে যদি বোবা কোন মেয়ে থাকে তাহলে দেখা যায় যে সে পরিবারের বিভিন্ন দাবি মেটানো থেকে শুরু করে সকাল-সন্ধ্যা পরিশ্রম করে। বিষয়টা এমন মনে হয় যে, মেয়েটি শুধু বিভিন্ন কাজ করার জন্যই যেন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি মনোভাব সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়, বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীরা যথেষ্ট সহানুভূতি ও সহযোগিতা পায় না। অনেক পরিবারই তাদের প্রতিবন্ধী মেয়েদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে ইচ্ছুক কিন্তু তারা শিক্ষক, ছাত্র এবং অন্যান্যদের কর্তৃক যৌন ও অন্যান্য হয়রানির ভয়ে তাদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে চাকুরী দেয়া হয় না। প্রতিবন্ধীদের সমস্যা চিহ্নিত করার পরও রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনও তৎপর নয়। প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সবেমাত্র শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক

মনোভাব অতি সম্প্রতি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। এ ইতিবাচক প্রক্রিয়ায় সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় ভূমিকা ক্রিয়াশীল।

১.৮ প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত কার্যাবলী

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী সমাজ ব্যবস্থায় কতগুলো বিশেষ সুবিধা রয়েছে; এসব সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে-আমাদের কমিউনিটি এবং পারিবারিক বন্ধন অনেক সমাজের তুলনায়ই শক্তিশালী। আমাদের কৃষি প্রধান সমাজে এ বন্ধন পল্লী এলাকায় বেশ দৃঢ়। সম্প্রতি জাতিসংঘ এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য কমিউনিটি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে পরিবার এবং প্রতিবেশীদের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশে পরিবার এবং কমিউনিটির লোকজনকে যদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাহলে তারা প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। বাংলাদেশের জনগণ সহানুভূতি ও হার্দ্য সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। প্রতিবন্ধীদের প্রতি যেকোন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক বন্ধনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কেননা প্রতিবন্ধিত্ব প্রতিরোধে অর্থনৈতিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিল্পপ্রধান দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রই প্রতিবন্ধীদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু বাংলাদেশের মত অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর একটি কৃষিপ্রধান দেশে যেখানে সম্পদের চরম সংকট বিদ্যমান, সেখানে রাষ্ট্র বা পরিবারের পক্ষে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের ব্যয়ভার বহন করা সহজ নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যদি পরিবারের সদস্যদেরকে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া হবে কম ব্যয়সাশ্রয়ী এবং বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য যেসব কর্মকাণ্ড নেয়া হয়েছে সেগুলোকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

ক। সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড;
খ। বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ড;
গ। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড;
ঘ। সহায়তা এবং পুনর্বাসনমূলক কর্মকাণ্ড এবং
ঙ। নেটওয়ার্কিং বা যোগাযোগ ব্যবস্থা।

১.৮.১. সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মকান্ড

যদিও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা নিরূপণের সঠিক কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি, তবুও প্রতিবন্ধীদের নিয়ে যে একবারেই কাজ হয়নি তা বলা যাবে না। আমাদের সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের প্রতিশ্রুতির কথা রয়েছে। ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪৭টি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালের পর আরো ১৭টি বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

সরকার বর্তমানে ৬৪টি জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি গ্রহণ করেছে। সমন্বিত অন্ধ শিক্ষা নীতির আওতায় ৫টি অন্ধ বিদ্যালয়, মূক এবং বধিরদের জন্য ৬টি, শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য ৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট যা প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, একটি কম্পিউটারাইজড্ ব্রেইলী প্রেস, একটি নকল লিম্ব এসেম্বলিং কেন্দ্র এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কেন্দ্র বর্তমানে সরকারের সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।[৫] বর্তমানে দেশে সরকারের ৭২টি বিভিন্ন ইউনিট প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে। দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধীর সামান্য অংশই এসব কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত হয়েছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী নীতি ও আইন

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি জাতীয় নীতি ঘোষণা করেছে। প্রতিবন্ধিত্ব প্রতিরোধ, চিহ্নিতকরণ, শিক্ষা, পুনর্বাসন, গবেষণা ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণের জন্য নীতিমালা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান শীঘ্রই গৃহীত হবে। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী এবং এতিমদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ কোটা বরাদ্দ রেখেছে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যে এ সংখ্যা শতকরা একভাগেরও কম।[৬]

প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত জাতীয় নীতি

১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত জাতীয় নীতি গৃহীত হয়। এ নীতিমালা জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নীতির আলোকেই করা হয়েছে। এ নীতিমালায় বাংলাদেশের সংবিধানস্বীকৃত নীতি ও মৌলিক মানবাধিকারের প্রতিফলন ঘটেছে। এখানে যে বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। প্রতিরোধ: সমগ্র দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিত্বের কারণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য প্রচার চালাতে হবে।

২। (ক) চিহ্নিতকরণ: প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধের জন্য প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিত করতে হবে। (খ) প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণের

[5] Speech of Prime Minister of Bangladesh in Inaugural Session of South Asian Conference of CBR Network, Dhaka, Bangladesh. 3-6 December 1997.
[6] Mohammad Farashuddin, The Integration of the Disabled as an Active Agent of Economic Growth.

জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষত আচরণের মাধ্যমে তাদের জন্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। অগ্রসর পর্যায়ে প্রতিরোধ: উপশমমূলক এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ পরিবার পর্যায় থেকেই গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

৪। যন্ত্রপাতি: প্রতিবন্ধিতার প্রকোপ কমাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করতে হবে।

৫। শিক্ষা: প্রতিবন্ধীর ধরনভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬। পুনর্বাসন: প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং যন্ত্রপাতির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

৭। মানব-সম্পদ উন্নয়ন: সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৮। কাজের সুযোগ সৃষ্টি: প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং কর্মক্ষেত্র তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৯। গবেষণা: সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি, প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

১০। স্বাভাবিক গতি এবং চলাচলের সুযোগ: রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত পরিবহন ব্যবস্থা এবং ভবনসমূহে প্রতিবন্ধীরা যাতে অবাধে চলাচল করতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১১। তথ্য: প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত তথ্য জনসমক্ষে এবং প্রতিবন্ধীদের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। বিনোদন: খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা, ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, রেডিও এবং টেলিভিশনে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

১৩। নেতৃত্বদান: প্রতিবন্ধীদের সর্বত্র চলাচলের মাধ্যমে তাদের নেতৃত্বে দেয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

১৪। অনুধাবন এবং সমন্বয়: প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত কার্যক্রম অনুধাবন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালক নিয়োগ করা যেতে পারে।

প্রতিবন্ধী জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত

সমাকজল্যাণ মন্ত্রীর তত্বাবধানে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ট্রাস্ট

প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন উন্নয়ন এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে পরামর্শ ও উপদেশ দেয়ার জন্য এ ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে।

শিক্ষানীতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতিতে সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইউনেসকো এ কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

বিশেষ শিক্ষা প্রদান সম্পর্কিত জাতীয় কেন্দ্র গঠিত

১৯৯১ সালে নরওয়ের তিনটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় এ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। এ কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মী প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন, সহযোগিতার ধরন এবং পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং পরামর্শ প্রদান। এ বিষয়ে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ফর স্পেশাল এডুকেশন কার্যক্রমে যে শিক্ষকরা প্রতিবন্ধী শিক্ষার সাথে জড়িত তারা প্রশিক্ষণে সহায়তা করবেন। প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; এখানে দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে এবং রয়েছে একটি রিসোর্স ইউনিট। এ ইউনিট প্রতিবন্ধীদেরকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। যেসব শিক্ষকরা প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সাথে জড়িত, তাদেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

শিশুবিকাশ কেন্দ্র

প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার জন্য ঢাকার শিশু হাসপাতাল সাহায্য প্রদান করছে এবং এখানে একটি শিশুবিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে বিভিন্ন চিকিৎসা, উপদেশ এবং প্রতিকার ও প্রতিবন্ধিত্ব প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

জাতীয় কোঅর্ডিনেন্স কমিটি

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করেছে। এ কমিটির প্রধান হচ্ছেন, সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ এ কমিটির সদস্য। সরকার অবশ্য জাতীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করেছেন এবং এখানে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাগণ সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ কমিটিতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং

ইউনিসেফকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ কমিটি সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করে থাকে।

১.৮.২. বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মকান্ড

সরকারের সীমিত প্রয়াসের পাশাপাশি বাংলাদেশে বেসরকারি অনেক সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে। এ সংস্থাগুলোর কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং নাগরিক হিসেবে তাদেরকে অধিকার সচেতন করে তোলা। বর্তমানে দেশে ৭১টি বেসরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে।

সম্প্রতি আশির দশক থেকে শুরু করে অনেকগুলো বেসরকারি সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে। এসব সংস্থার সমন্বয়ে ন্যাশনাল ফোরাম অফ অর্গানাইজেশনস্ ওয়ার্কিং উইথ্ ডিসএবলড যা সংক্ষেপে NFOWD গঠিত হয়েছে। ১৯৯২ সালের গঠনের পর এ সংস্থা প্রতিবন্ধীদের জন্য বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে যা প্রতিবন্ধীদের সমসুযোগ, অধিকার এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ সংক্রান্ত খসড়া আইন প্রণয়ন করে অনুমোদনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় এবং পার্লামেন্টারি এফেয়ার কমিটিতে প্রেরণ করেছে। এ খসড়া আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বলতে অসুখে, দুর্ঘটনায়, চিকিৎসা ত্রুটি বা জন্মগতভাবে যদি কোন ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার কর্মক্ষমতা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায় অথবা তুলনামূলক হ্রাস পায়, তাহলে সেই ব্যক্তিকে বোঝাবে। এ আইন দ্বারা ৭ (সাত) ধরনের প্রতিবন্ধীকে চিহ্নিত করা হয়েছে: (১) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (২) শারিরীক প্রতিবন্ধী (৩) শ্রবণ প্রতিবন্ধী (৪) মানসিক প্রতিবন্ধী (৫) চরম প্রতিবন্ধী (৬) বাক প্রতিবন্ধী (৭) একাধিকভাবে প্রতিবন্ধী। এ খসড়া আইনে সরকার তাঁর আর্থিক সক্ষমতা এবং উন্নয়নের সীমার মধ্যে প্রতিবন্ধিতার কারণ প্রতিরোধের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও নিরোধ, শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, চরম ও একাধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসন, প্রতিবন্ধীদের অধিকার সন্তোষজনক করণার্থে জনবল উন্নয়ন, প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রতিবন্ধীদের সমস্যা নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখা, প্রতিবন্ধীদের মুক্ত এলাকায় যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ সুবিধাসমূহ, তথ্যের অধিকার, চিত্তবিনোদনের অধিকার, নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণমূলক সংগঠনে উৎসাহ প্রদান সম্বলিত আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো উত্থাপিত হয়েছে এ খসড়া আইনে[৭]।

[7] প্রতিবন্ধীবিষয়ক খসড়া আইন

বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থা ১৯৭০-এর দশক থেকে কার্যক্রম শুরু করলেও ৮০ এবং ৯০-এর দশকে তা বিস্তারলাভ করে। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে এমন সংস্থাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

ক) সংস্থাসমূহ যারা শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে; এবং
খ) সংস্থাসমূহ যারা কমিউনিটি পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বেসরকারি সংস্থাসমূহ মূলত: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তাসহ চিকিৎসা সেবা, প্রতিবন্ধীদের কল্যাণার্থে আইন প্রণয়নের সুপারিশ এবং যোগাযোগ বা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য কাজ করে থাকে।

শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। কেননা প্রতিবন্ধীদের ধরন একরকম নয়। রয়েছে আলাদা আলাদা ধরনের প্রতিবন্ধী। দেখা যাচ্ছে কেউ মানসিক, কেউ শারিরীক, কেউ উভয় প্রকার প্রতিবন্ধিত্বেরই শিকার। কেউ সম্পূর্ণ অন্ধ, আবার কেউ স্বল্প হলেও দেখতে পায়, কেউ বাক প্রতিবন্ধী কেউ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। শারীরিক প্রতিবন্ধীরও রয়েছে ভিন্নতা। যেসব প্রতিবন্ধীদের পা নেই তাদের সমস্যা আবার যে ব্যক্তির হাত নেই তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। মানসিক প্রতিবন্ধীদেরও রয়েছে বিভিন্ন প্রকার মানসিক প্রতিক্রিয়া। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক কিছুই বিবেচনায় রেখে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিন্যাস করা প্রয়োজন।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে দু'ধরনের পদ্ধতি অবলম্বিত হয় (ক) প্রশিক্ষকদের জন্য একধরনের কারিক্যুলাম এবং (খ) প্রতিবন্ধীদের জন্য এক ধরনের কারিক্যুলাম। বাংলাদেশে এ দু'ধরনের কারিক্যুলাম পরিচালনা করছে এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

১৯৯১ সালে ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কার্যক্রমে তিনটি নরওয়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান-নরওয়েজিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি ব্লাইন্ড এন্ড পারসিয়ালি সাইটেড, নরওয়েজিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি ডীফ এবং নরওয়েজিয়ান এসোসিয়েশ ফর দি মেন্টালি রিটারডেড সহায়তা যোগাচ্ছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন সাধারণত তিন ধরনের প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদান করে থাকে- মানসিক, দৃষ্টি এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী। এ সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রেসিডেনসিয়াল স্কুল এবং সরকারি রিসোর্স ইউনিট।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব্ স্পেশাল এডুকেশন দৃষ্টি এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ড. সুলতানা এস জামান এ ডিপার্টমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা

এক হিসেবে দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ৩৬ লাখেরও বেশী মানসিক প্রতিবন্ধী রয়েছে। এমন প্রতিবন্ধীদের মানসিক ভারসাম্যহীনতার অনেক কারণ রয়েছে। এসব কারণগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলোই প্রধান-

- **জেনেটিক বা বংশগত:** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বংশগত কারণেও মানসিক প্রতিবন্ধীর জন্ম হতে পারে এবং জীনগত ত্রুটির জন্য বংশ পরম্পরায় কোন পরিবারে এ অবস্থা চলতে পারে।
- **পরিবেশগত:** কোন বিরূপ পরিবেশে শিশুর জন্ম হলেই শিশু মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- **ত্রুটিপূর্ণ লালন পালন:** অপুষ্টি, অবহেলা এবং গর্ভাবস্থায় কোন ক্ষতিকর ঔষধ বা অন্য কোন পদার্থ গ্রহণ করলে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে।
- **মা-বাবার ত্রুটিপূর্ণ রক্তের গ্রুপ:** যদি কোন মায়ের রক্তের গ্রুপের আর এইচ নেগেটিভ হয় এবং বাবার একই গ্রুপ রক্তের আর এইচ পজেটিভ হয় এবং তাদের যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ সন্তানের যদি আর এইচ পজেটিভ হয় তাহলেও ঐ সন্তান মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হতে পারে।
- **বিষক্রিয়া:** গর্ভাবস্থায় বিষক্রিয়ার ফলে সন্তান মানসিক ভারসাম্যহীন হতে পারে। জন্মের সময় সন্তান যদি রুবেলা, জার্মান হিউস, সিফিলিস এবং ইক্সোপোলোমসিস দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলেও শিশুরা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- মেটাবলিজম এবং অপুষ্টিজনিত কারণেও শিশুর মানসিক বৈকল্য দেখা দিতে পারে।
- **মাথায় আঘাত:** গর্ভস্থ ভ্রূণের মাথায় আঘাত, প্রসবের সময় আঘাত বা শৈশবে মাথায় আঘাত, এসফিক্সিয়া (অক্সিজেনের অভাবজনিত রোগ), ব্রেইন হ্যামারেজ এসব কারণেও শিশু মানসিক ভারসাম্য হারাতে পারে।
- **মস্তিস্কের রোগ:** টিউমার, নিউরো ফাইবেনমেটাইসিস, যক্ষ্মা এবং হানটিংটন ফোবিয়া জনিত কারণেও শিশুরা মানসিকভাবে পঙ্গু হতে পারে।
- **জন্মপূর্ব অজানা রোগ:** গর্ভাবস্থায় কিছু অজানা কারণের জন্য মানসিকভাবে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা ব্রেইনের কোন অংশের ক্ষত সংগঠিত হতে

পারে অথবা অস্বাভাবিক ছোট বা বড় মাথা দেখা দিতে পারে। এসব কারণেও শিশুরা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- **ক্রোমোসোমাল ডিসটরসন:** ক্রোমোসোমাল ডিসটরসন গর্ভস্থ ভ্রুণের ক্ষতি করে এবং এতে আক্রান্ত শিশু মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হতে পারে।
- **গর্ভাবস্থার জটিলতা:** প্রিম্যাচিউর ডেলিভারী বা সঠিক সময়ের পূর্বে বাচ্চার জন্ম (শেষ মাসিকের প্রথম দিন থেকে শুরু করে গর্ভাবস্থার ৩৭ সপ্তাহের পূর্বে ভূমিষ্ঠ হওয়া), কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করা বা দীর্ঘ প্রসব বেদনাও শিশুর মানসিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- **নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন:** নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের কারণেও অনেক সময় শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে।

মানসিক প্রতিবন্ধিতার তীব্রতার রকম ভেদে প্রতিবন্ধীদেরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। (১) মডারেট বা খুব বেশী ভারসাম্যহীন নয় এমন (২) মাঝামাঝি (৩) তীব্র (৪) খুব বেশী তীব্র। সাধারণত: মানসিক প্রতিবন্ধীদেরকে এ চারভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে মানসিকভাবে ভারসাম্যহীনদের নিয়ে কোন চিন্তাভাবনা করা হয়নি। যদিও বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশ যা প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকারকেও স্বীকার করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার এ সময় পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য কোন বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ডা. জামান সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড্ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করেন। মানসিক প্রতিবন্ধীদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষার ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের আগে ছিল না। ডা. জামান ঢাকা মেডিকেল কলেজে সর্বপ্রথম এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড বাংলাদেশ ছাড়াও প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন, শিশুবিকাশ কেন্দ্র বাংলাদেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে।

বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন মূলত ডায়গনস্টিক সেবা, শিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গবেষণাও করছে। এ সংস্থার একটি আধুনিক রোগ নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে মানসিক অবস্থার এবং বিভিন্ন প্রকার ক্লিনিক্যাল টেস্ট করা হয়। এখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য পরামর্শ সেবাও দেয়া হয়। কল্যাণী নামে একটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

এখানে শিশুরা চিত্তবিনোদনসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন - কাঠ, নক্সা এবং মাটির তৈজসপত্র তৈরি করা প্রভৃতি শিখছে। কল্যাণীর রয়েছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের আওতায় শিশুরা এবং শিশুদের অভিভাবকরা বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ধামরাইয়ে অবস্থিত 'দিশারী' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন এযাবৎ বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ঢাকার কোন ব্যক্তি হলে তার থেকে ২০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি এবং ঢাকার বাইরের কারো নিকট থেকে এ ফি নেয়া হয় না।

সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড বাংলাদেশের মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করার সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর মেন্টালি রিটারডেড; সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড-এর একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং নরওয়ে দাতা হিসেবে কাজ করছে। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর মেন্টালি রিটারডেড সংস্থাটিকে বর্তমানে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর দি ইনটেলেকচুয়্যালি ডিসএ্যাবলড্ করা হয়েছে। এসকল সংস্থার তৎপরতা ও কর্মকাণ্ডের ফলে মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের আচরণগত অনেকটা হলেও পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড-এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মোট চার হাজার প্রতিবন্ধী শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সেবা পাচ্ছে। এসব সেবাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-পরামর্শদান, ফিজিওথেরাপি, স্পীচ থেরাপি ইত্যাদি। এ কেন্দ্রগুলো থেকে প্রতিবন্ধীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ারও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ইনটেলেকচুয়্যালি ডিসএ্যাবলড্ প্রতিবন্ধী শিশুদের পিতামাতাদের থেকে দলের সদস্য মনোনয়ন করে থাকে। সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড প্রোর্টেজ প্রোগ্রাম এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কমিউনিটি-বেইজড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রামের ভিত্তিতে কমিউনিটি-বেইজড্ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সংস্থা ১৯৮৪ সাল থেকেই এ কার্যক্রম পরিচালন করছে।

এ সংস্থার ৩৬টি শাখার মধ্যে ১৭টি শাখা কমিউনিটি-বেইজড্ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ১৯৯৭ সনের প্রাপ্ত এক হিসেবের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এ কার্যক্রমে এযাবৎ মোট ৮শ' ৭৬ জন শিশু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যেসব প্রতিবন্ধী শিশুরা বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থ সেসব শিশুদের জন্য সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড কমিউনিটি-বেইজড্ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কিছু সংখ্যক কর্মী বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবারের একজন সদস্যকে প্রতিবন্ধীদের যত্ন কিভাবে নিতে হয় তা শেখান এবং পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তিই প্রতিবন্ধীকে প্রশিক্ষিত করে তোলেন। সোসাইটি ফর দি কেয়ার এন্ড এডুকেশন অব দি মেন্টালি রিটারডেড সংস্থাটির নাম পরিবর্তন করে সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি ইনটেলেকচুয়্যালি ডিসএ্যাবল্ড করা হয়েছে।

চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং সেন্টার ফর দি মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ-এ দুটো কেন্দ্র ঢাকা শিশু হাসপাতালের অধীনে পরিচালিত এবং প্রতিবন্ধী চিকিৎসায় এ দুটো কেন্দ্র খুব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দি এসিসটিভ ডিভাইস এন্ড নেট: প্রতিবন্ধীদের সহায়ক বস্তু উৎপাদন এবং এর বিতরণের জন্য এ্যাসিসটিভ ডিভাইস নেটওয়ার্ক ৭টি সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এ সংস্থা প্রতিবন্ধীদের সহায়ক এমন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, প্রস্তুত এবং তা বিতরণ করবে। এ সাতটি সংস্থার মধ্যে রয়েছে সেন্টার ফর দি রিহ্যাবিলিটেশন অব্ দি প্যারালাইজড (CRP), ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি স্পেশাল এডুকেশন, বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর দি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার, এমপ্লয়মেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন ফর দি ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড, হীড-বাংলাদেশ, হাইকেয়ার এবং ইন্টারলাইফ-বাংলাদেশ। এসব সংস্থা প্রতিবন্ধীদের জীবনধারণের জন্য সহায়ক এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন, প্রস্তুত এবং বিতরণ করে থাকে। এড নেট ১৯৮৮ সালে স্থাপিত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহায়ক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ;
- সহায়ক যন্ত্রপাতির সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- সহায়ক যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কিত দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধিকরণ;
- সহায়ক যন্ত্রপাতির জন্য টেকসই পদ্ধতির উন্নয়ন; এবং
- সহায়ক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়।

যেসব সংস্থা প্রতিবন্ধীদের সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরি করে, তার মধ্যে রয়েছে- ইন্টারলাইফ-বাংলাদেশ। এ সংস্থাটি ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে। সংস্থাটি বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সহায়তামূলক যন্ত্রপাতি তৈরি। এরা হুইল চেয়ার, বিশেষ ধরনের তিন চাকার সাইকেল, দাঁড়ানোর সহায়ক টেবিল, বোর্ড, বিশেষ কর্নারসীট এবং প্যারালেল বার বিশেষত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তৈরি হয়।

হাইকেয়ার নামে অন্য একটি সংস্থা ১৯৮০ সন থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে। সংস্থাটি আংশিক শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে। যেসব শিশুরা শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী তাদেরই এই সংস্থা বেশী গুরুত্বারোপ করে। শ্রুবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য শ্রবণ শক্তি বাড়ানোর কোন সহায়ক পদ্ধতি ১৯৯৮ সালের আগে এদেশে আবিস্কৃত বা স্থানীয়ভাবে তৈরি হয়নি। ইতিপূর্বে শ্রুবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য এসব সহায়ক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করা হত। কিন্তু হাইকেয়ার এদেশে শ্রবণশক্তি বাড়ানোর জন্য সহায়ক পদ্ধতি তৈরির জন্য এদেশে সর্বপ্রথম ল্যাবরেটরি গড়ে তোলে। এমপ্লয়মেন্ট রিহেবিলিটেশন অব্ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড্ নামে অন্য একটি সংস্থা প্রধানত: শ্রবণ পদ্ধতি উদ্ধাবন করে। তারা ব্রেইলী পদ্ধতিতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বই ছাপানোর জন্য একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছে। এ সংস্থা যেসব সহায়ক পদ্ধতি তৈরি করে তার মধ্যে রয়েছে-নকল হাত, পা বা পায়ের উপরের এবং নিচের অংশ, ব্রেস, ঘাড়-কলার ইত্যাদি। বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ১২ বছর বয়সের নিচের প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যাকস্লাব, ক্যালিপার, ওয়াকিং ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি করে। আর্টিফিসিয়াল লিম্ব প্রোডাকশন ইউনিট হীড-বাংলাদেশেরই একটি ইউনিট। টঙ্গীতে বিসিক শিল্প নগরীতে এ ইউনিটটি অবস্থিত।

এখানে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সহায়ক পদ্ধতি তৈরি করা হয়। নকল হাত-পা তৈরি করে তা ব্যবহারকারীদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব্ দি প্যারালাইজড-এর ধাতব সহায়ক যন্ত্র তৈরি করার একটি কারখানা রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের হুইল চেয়ার, নিচু ট্রলি, কনুই ক্র্যাচ, হাঁটার লাঠি, ব্যাক স্লাব, ষ্ট্রাইকার স্লাব, সার্ভিক্যাল কলার, টম ট্রাকশন, রাইটিং স্পিলিষ্ট, ষ্ট্রেচার ট্রলি, ক্যালিপার, ট্রাই সাইকেল, হাঁটার জন্য বিশেষ ফ্রেম ইত্যাদি তৈরি করে। এ সংস্থা তাদের তৈরি হুইল চেয়ার বিদেশেও রপ্তানী করে থাকে। দি ন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন একটি সরকারি সংস্থা এবং প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য এ সংস্থার একটি কর্মশালা রয়েছে।

১৯৯৮ সালের এপ্রিল মাসে সহায়ক যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকরণ ও বিতরণ সম্পর্কিত একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এ কর্মশালায় যে সুপারিশমালা পেশ করা হয় তা হল:

- মানসম্পন্ন, আকর্ষণীয় এবং টেকসই যন্ত্রপাতি তৈরিকরণ
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি তৈরি
- নিম্নআয়ের পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্য মূল্যে তা বিক্রয় এবং
- সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের কাছে এতদসংক্রান্ত তথ্য পৌঁছানো।

১.৮.৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগঃ উন্নয়ন প্যাকেজ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা

১৯৫৮ এবং ১৯৬৯ সনের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত টেকনিক্যাল রিপোর্টে পুনর্বাসন প্রক্রিয়াকে যখন স্বাস্থ্য সেবার অংশ বলে মন্তব্য করা হয়েছিল তখনই মূলত কমিউনিটি-বেইজড্ রিহ্যাবিলিটেশন কার্যক্রম বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এ প্রতিবেদনে অবশ্য সুপারিশ করা হয়েছিল যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূল্য-সাশ্রয়ী প্রাতিষ্ঠানিক সেবার সুযোগ থাকতে হবে। এশিয়া এবং প্যাসিফিক এলাকার জন্য সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কমিশন ১৯৯৩-২০০২ সালকে এশিয়া এবং প্যাসিফিক এলাকার প্রতিবন্ধীদের দশক ঘোষণা করেছে এবং এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে-প্রতিবন্ধীদের জন্য কমিউনিটি-নির্ভর উন্নয়নমূলক কাজের প্রসারের জন্য প্রচার করা। কমিউনিটি-নির্ভর কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল-প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের সাথে পরিবার এবং কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা। কমিউনিটি-নির্ভর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে মূলতঃ জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত প্রচেষ্টার ফলেই। বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংস্থা কমিউনিটি-নির্ভর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছে।

আন্তঃসংস্থা সম্পর্কিত সমন্বয়

আন্তর্জাতিকভাবে যেসব সংস্থা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থাসমূহের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সংযোগ। ডিসএ্যাবলড্ পিপলস ইন্টারন্যাশনাল (DPI), ইনকুলুসন ইন্টারন্যাশনাল (ইন্টারন্যাশনাল লীগ অব্ সোসাইটি ফর পারসন উইথ্ মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ), রিহ্যাবিলিটেশন ইন্টারন্যাশনাল, এশিয়ান ফেডারেশন ফর মেন্টালি রিটারডেড (AFMR), সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর সিবিআর, সার্ক সেন্টার ফর ডিসএ্যাবলড, এসকাপ এবং জাতীয় ফোরাম ফর দি অর্গানাইজেশন ওয়ার্কিং উইথ ডিসএ্যাবলড সহ এ ফোরামে ৪৬টি সংস্থা কাজ করছে এবং বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক অর্জন সম্ভব হয়েছে।

সাউথ এশিয়ান সিবিআর বা দক্ষিণ এশিয়া কমিউনিটি-বেইজড রিহ্যাবিলেটেশন কার্যক্রম ১৯৯২ সালে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নেপালে অনুষ্ঠিত সিবিআর নেটওয়ার্ক সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশ নিয়েছিল। সিবিআর নেটওয়ার্কের সদস্য দেশগুলো হচ্ছে: বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। এ নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে: তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়করণ, অভিজ্ঞতা বিনিময়, সংস্থাসমূহের মধ্যে কারিগরী সহায়তা প্রদান এবং বিনিময় এবং সরকারকে আইন প্রণয়ন এবং নীতিনির্ধারণে প্রভাবিত করা এবং একই এলাকায় একাধিক সংস্থা কর্তৃক একই কার্যক্রম পরিহার করার নীতি গ্রহণ।

কমিউনিটি-নির্ভর বাংলাদেশ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- কমিউনিট-নির্ভর পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয়;
- সদস্য দেশসমূহের তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিতরণ করা;
- কমিউনিটি-নির্ভর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা পরিচালনায় সদস্য দেশসমূহকে সাহায্য করা এবং
- জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মিটিং, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ইত্যাদির আয়োজন করা।

বাংলাদেশীদের দ্বারা অথবা বাংলাদেশীদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এমন সংস্থাগুলো হল:

১। ডিসএ্যাবল পিপল ইন্টারন্যাশনাল
২। ইনক্লুসন ইন্টারন্যাশনাল
৩। রিহেবিলেটেশন ইন্টারন্যাশনাল
৪। এশিয়ান ফেডারেশন ফর দি মেন্টালি রিটারডেড
৫। সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর সিবিআর
৬। সার্ক সেন্টার ফর ডিসএ্যাবল
৭। এসকাপ
৮। এন এফ ডবিউ ও ডি।

কমিউনিটি-বেইজড পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ

এ,এইচ,এম নোমান খান তাঁর একটি প্রবন্ধে কমিউনিটি-বেইজড্ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় পুনর্বাসন উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সমাজে অনুকুল মনোভাব সৃষ্টি, পুনর্বাসন সেবার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, আয়মূলক কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং চিকিৎসা সেবার সৃষ্টি করা। প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধকরণ, ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং এবং মূল্যবোধের উপরও সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে প্রতিবন্ধিতাকে উন্নয়নের ইস্যু হিসেবে এবং প্রতিবন্ধীর সমস্যাকে উন্নয়নের প্রধান ধারার সাথে সম্পৃক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সেকেন্ড সাউথ এশিয়ান কনফারেন্স অব সিবিআর নেটওয়ার্ক শেষে 'ঢাকা ঘোষণা' নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। এ ঘোষণাপত্রে এশিয়া এবং প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য গৃহীত অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের ঘোষণার কথা এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ঘোষিত প্রতিবন্ধীদের দশক ১৯৯৩-

২০০২ এর 'প্রতিবন্ধীদের সম-সুযোগ, সম-অধিকার এবং পূর্ণ অংশগ্রহণ সম্পর্কিত' ঘোষণা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটি বেইজড্ রিহেবিলিটেশনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। ঘোষণায় এ অঞ্চলের সব সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যেন প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে দেখা এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় সে লক্ষ্যে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেন সমাজের সর্বস্তরে অজ্ঞতা, ভয় এবং কুসংস্কার দূরীকরণে সমাজের সর্বত্র প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ সংরক্ষণে তার অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রতিবন্ধীদের সেবা প্রদানের বাধাগুলো অপসারণের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ ঘোষণাপত্রে। এ ঘোষণায় সরকারি, বেসরকারি ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধানসহ প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ-সংরক্ষিত জাতীয় নীতিমালা ঘোষণা ও বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।[৮]

জওহারেল ইসলাম মামুন তাঁর 'কান্ট্রি রিপোর্ট'- এ উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটি-বেইজড নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং প্রতিবন্ধীদের নিয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় কাজ শুরু করেছে। কমিউনিটি- বেইজড রিহেবিলিটেশন হচ্ছে এমন একটি কৌশল যে কৌশল অবলম্বন করে পুনর্বাসন, সুযোগের সমতা সৃষ্টি এবং প্রতিবন্ধীদের প্রতি সামাজিক সহমর্মিতা প্রকাশ করা সম্ভব। তিনি তার এ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ প্রতিবন্ধী রয়েছে এবং এর সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও বাংলাদেশের রয়েছে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, দক্ষ জনশক্তির এবং কারিগরি সুযোগ-সুবিধার অভাব তথাপিও বাংলাদেশ সম্প্রতি প্রতিবন্ধী সমস্যাকে একটি মানবিক সমস্যা বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। এশিয়া এবং প্যাসিফিক প্রতিবন্ধী দশকের (১৯৯৩-২০০২) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত প্রতিবন্ধীদের অধিকার সনদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের সম-অধিকার, সুযোগ এবং অংশগ্রহণবিষয়ক সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

তিনি তাঁর প্রবন্ধে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এবং 'মানসিক প্রতিবন্ধীদের অধিকারবিষয়ক সনদ' ঘোষণা করে; পরবর্তীতে ১৯৮১ সালকে প্রতিবন্ধীদের আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে; ১৯৮২ সনে 'ওয়ার্লড প্রোগ্রাম

[8] Second South Asian Conference of CBR Network Dhaka, Bangladesh 3-6 December, 1997.

অব্ এ্যাকশন' ঘোষণা করে প্রতিবন্ধী সমস্যা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ১৯৮৩-৯২ সময়কালে জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী দশক বলে ঘোষণা করে এবং এর উদ্দেশ্য ছিল:

- প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি;
- সদস্য রাষ্ট্রগুলো যাতে প্লান অব্ এ্যাকশন বাস্তবায়িত করে; এবং
- প্রতিবন্ধীদের প্রতি আর্থিক এবং কারিগরি সুবিধা বৃদ্ধিকরণ।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাজে অন্য নাগরিকদের মত সম-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুবিধার সৃষ্টি করা এবং সেবা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের উৎপাদনশীল করে তোলা।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সনদের সফল বাস্তবায়ন নানা বাস্তব কারণে সম্ভব হচ্ছে না। জাতিসমূহের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব এবং সম্পদের অপ্রতুলতাও লক্ষ্যণীয়। জাতিসংঘ সনদ এবং প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৯৫ সালের ৯ নভেম্বর ক্যাবিনেট কমিটি প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত জাতীয় নীতি অনুমোদন করেছে এবং বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীসহ 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতিও ঘোষণা করেছে। জনাব ইসলাম তার প্রবন্ধে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী সমস্যা সমাধানের যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কেবিনেট কমিটি ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত জাতীয় নীতি সংক্রান্ত বিল পাস করেছে। এ নীতি নির্ধারণীতে প্রতিবন্ধী প্রতিরোধ চিহ্নিতকরণ শিক্ষা এবং পুনর্বাসন, গবেষণাসহ প্রতিবন্ধীদের স্বার্থে গৃহীত কর্মকাণ্ড ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছে। এসব নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য আইন প্রণয়ন বিষয়টিও খুব জরুরী। এখানে উল্লেখ্য যে সরকার চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য শতকরা ২০ ভাগ আসন সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এখনও তা সংসদে পাশ হয়ে আইন হিসেবে গৃহীত হয়নি।

আমাদের দেশে প্রতিবন্ধী ইস্যুর প্রতি যে সম্প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তার বৈষম্য বাংলাদেশ এবং ভারত কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য গৃহীত কার্যাবলী থেকেই সুস্পষ্ট:

ক্রম	ভারত	বাংলাদেশ
১	পুনর্বাসন কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া	কোন কাউন্সিল গঠিত হয়নি
২	চারটি প্রতিবন্ধী ইনস্টিটিউট (প্রতি ধরনের প্রতিবন্ধীর জন্য আলাদা আলাদা)	কোন প্রতিবন্ধী ইনস্টিটিউট নেই
৩	আঞ্চলিক পুনর্বাসন কেন্দ্র	আংশিকভাবে করা হয়েছে
৪	জাতীয় হ্যান্ডিক্যাপ্ড ফাইন্যান্স এবং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার	এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই
৫	আর্টিফিসিয়াল লিম্ব ম্যানুফ্যাকচারিং করপোরেশন অব ইন্ডিয়া	সম্প্রতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকের একটি ইউনিট এ ধরনের একটি সংস্থা গড়ে তুলেছে
৬	অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহেবিলিটেশন ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ	এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই
৭	দেশব্যাপী বিশেষ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গঠিত হয়েছে	বাংলাদেশে চাকুরী ক্ষেত্রে শতকরা ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষিত হয়েছে
৮	ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন ফার্ম	ন্যাশনাল সেন্টার ফর দি স্পেশাল এডুকেশন
৯	জেলা প্রাইমারী এডুকেশন প্রোগ্রাম	এডুকেশন কাউন্সিল

অধ্যায়-২
গবেষণার যৌক্তিকতা পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

২.১. গবেষণার যৌক্তিকতা

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে ১ কোটি ৩০ লক্ষ প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা রয়েছে এবং এ প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৭০ ভাগ অক্ষর জ্ঞানহীন। প্রতিবছর বাংলাদেশে ২ লক্ষ ৫০ হাজার প্রতিবন্ধী বাড়ছে। প্রতিবছর ৩০ হাজার শিশু দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করছে।

অতিরিক্ত দারিদ্র, অনিরাপদ সন্তান প্রসব, বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অপুস্টি, ভিটামিন-এ এর অভাবজনিত অন্ধত্ব, লৌহ এবং আয়োডিন ঘাটতি, পরিবেশ বিপর্যয়, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন ইত্যাদি কারণে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা সমাজে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত কোন সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে দারিদ্র এবং প্রতিবন্ধীদের যোগসূত্র সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কেননা প্রতিবন্ধিত্ব সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দারিদ্র দূরীকরণই একমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নয়, সামগ্রিক অর্জনের জন্য একই সাথে মানবাধিকার, সামাজিক নির্ভরতা, দুর্যোগ এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের কথাও বিবেচনা করতে হবে। বর্তমান গবেষণায় যে বিষয়গুলো সম্পর্কিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে তাহলো- (ক) দারিদ্রের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত (খ) প্রতিবন্ধীত্ব এবং দারিদ্র (গ) তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সম্পর্কিত ধারণা এবং (ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রচলিত কার্যক্রম এবং এ সম্পর্কে জনগণের ধারণা অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান গবেষণায় প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে অবহিত হয়ে তাদের প্রতি সেবা প্রদানের অবকাঠামোগুলো চিহ্নিত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.২. গবেষণার উদ্দেশ্য

- শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি অবহিত হওয়া এবং বিশ্লেষণ করা;
- মানবাধিকার সম্পর্কে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের মনোভাব এবং প্রতিবন্ধিত্ব সম্পর্কে তাদের জ্ঞান যাচাই করা;

- মানবাধিকার সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়ের ধারণা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা এবং এসব তথ্য প্রতিবন্ধীদের জন্য কার্যক্রম/ প্রকল্প উন্নয়ন এবং যেসব সংস্থা বা ব্যক্তি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে তাদের জন্য সহায়ক হয় এমনভাবে তা উপস্থাপন করা;
- প্রতিবন্ধীদের প্রতি সেবাদান এবং তাদের দারিদ্রের স্বরূপ অবহিত হওয়ার প্রয়াস নেয়া;
- কার্যক্রমের সাথে দারিদ্রের প্রভাব ও কারণ এবং মানবাধিকার ও সামাজিক আচরণের যোগসূত্র বিশ্লেষণ;
- নির্দিষ্ট এলাকায় মানবাধিকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার ধরন যাচাইকরণ;
- প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার সচেতন করার প্রয়াস নেয়া; এবং
- নীতি নির্ধারক ও জনগণের মাঝে প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকারের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা।

২.৩. গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণগত এবং পরিমানগত পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. একটি নিবিড় আনুভূমিক জরিপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এ গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়েছে এবং তা গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. প্রতিবন্ধীদের সম্পূর্ণ অবস্থা গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য 'দলগত আলোচনা' পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়েছে।

৩. প্রশ্নমালার সাহায্যে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সে তথ্যের সাথে গভীর সম্পূরক তথ্য উপস্থাপন করার লক্ষ্যে ২০ জন প্রতিবন্ধীর জীবনালেখ্য তৈরি করা হয়েছে।

৪. প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার ইস্যু গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য এবং এডভোকেসি সেবা উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতি (চজঅ) এবং কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি (ঝচঅ) অবলম্বন করা হয়েছে।

৫. বাংলাদেশ এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে এমন বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা এবং তা বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার এবং প্রাসঙ্গিক ইস্যুগুলো বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

২.৪. গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

গবেষণার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়িত কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে: প্রতিবন্ধীদের থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩ শত প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়েছে; নমুনায়ন করা হয়েছে দৈব চয়নের ভিত্তিতে ।

অংশগ্রহণমূলক গবেষণা পদ্ধতিতে দলগত আলোচনা করা হয়েছে । এসব আলোচনায় বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবন্ধী যেমন-অন্ধ, শারীরিকভাবে অবশ-হয়ে যাওয়া ব্যক্তি, মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের নিকট থেকে এ তথ্য নেয়া হয়েছে । কর্মরত বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কনসালটেটিভ সেশন করা হয়েছে ।

প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করছে এমন সংগঠনের প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধীদের পিতামাতা বা শিক্ষকদের মতামত নেয়ার জন্য একদিনের আলোচনা সেশন করে এ বিষয়ে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করা হয়েছে । তদুপরি গবেষণার বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংক্রান্ত দলিলপত্র, সাংবিধানিক ভাষ্য, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে ।

গবেষণা কর্মটি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গবেষণার সাথে জড়িত গবেষণা সহযোগী এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের পূর্বে পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ।

গবেষণাকাল

এ গবেষণা কর্মটি মোট এক বছর সময়ে (জুন ২০০০ থেকে মে ২০০১) সম্পন্ন করা হয়েছে ।

অধ্যায় -৩
গবেষণার ফলাফল

৩. গবেষণার ফলাফল

বর্তমান গবেষণায় গবেষণালব্ধ প্রাপ্ত ফলাফল-বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার, মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা এবং মনোভাব, গবেষণার প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বা মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রসমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১. প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

জরিপের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে-প্রতিবন্ধীদের ধরন, বৈবাহিক অবস্থা, লিঙ্গের বিভাজন, খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়, সন্তান সংখ্যা, বাসস্থানের ধরন ইত্যাদি।

৩.২. প্রতিবন্ধিত্বের ধরন

চিত্র ১ : প্রতিবন্ধিতার ধরন

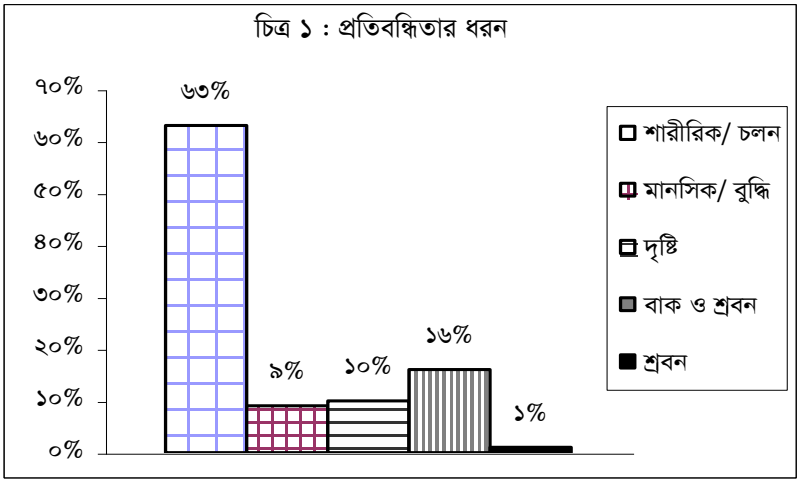

চিত্র থেকে (চিত্র ১) দেখা যাচ্ছে যে, সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এমন প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৬৩.০ ভাগ শারীরিক প্রতিবন্ধী। এরপরে রয়েছে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী

শতকরা ১৬.৩ ভাগ এবং দৃষ্টি ও মানসিক প্রতিবন্ধী রয়েছে যথাক্রমে শতকরা ১০.০ ও ৯.৩ ভাগ। শ্রবণ প্রতিবন্ধী সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়েছে- শতকরা ১.৩ ভাগ।

৩.৩. বৈবাহিক অবস্থা

প্রতিবন্ধীদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গবেষণা এলাকায় মোট প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শতকরা ৪৮.০ ভাগ বিবাহিত এবং অবিবাহিত শতকরা ৫২.০ ভাগ। নির্বাচিত এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৬৩.৭ ভাগ পুরুষ এবং ৩৬.৩ ভাগ মহিলা। (চিত্র ২)

চিত্র ২: প্রতিবন্ধিত্বের ধরন

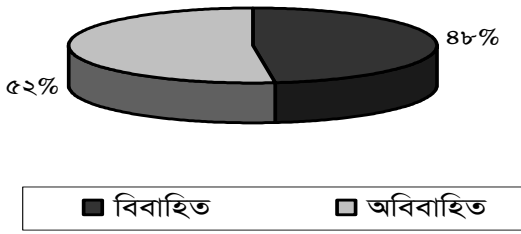

৩.৪. প্রতিবন্ধী খানা প্রধানের শিক্ষা

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, অশিক্ষা এবং দারিদ্রের সাথে প্রতিবন্ধীদের একটা যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে দারিদ্র অনেকটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন- দরিদ্র শ্রেণী স্বাস্থ্য সচেতন নয়, কোন রোগের রোগ-ব্যাধির সময়মত চিকিৎসা নিতে পারে না। ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজ তাদের অনেকটা বড় অবলম্বন; দরিদ্রতার জন্য গর্ভবতী মহিলারা প্রসবপূর্ব সেবা নিতে পারে না। অর্থাৎ সন্তান জন্মের সময় ডাক্তার, নার্স বা কোন প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সহায়তা নিতে পারে না অথবা সন্তান জন্মের পর সঠিক লালন-পালন প্রক্রিয়াও তাদের অজানা। তদুপরি, তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এমতাবস্থায় জরিপের সময় প্রতিবন্ধীদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে অনুধাবনের জন্য প্রতিবন্ধীদের পরিবারের প্রধান বা খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বর্তমান আয়, সন্তান সংখ্যা ও বাসস্থানের ধরন জানতে চাওয়া হয়েছে।

সারণী ১: খানা প্রধানের শিক্ষাগত যোগ্যতা		
নির্দেশক	গনসংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	১১২	৩৭.৩
স্বাক্ষর করতে পারে	৫৪	১৮.০
১ - ৫	৭১	২৩.৭
৬ - ১০	৩৫	১১.৭
১১ +	২৮	৯.৩
মোট	**৩০০**	**১০০**

সারণী ১ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন পরিবারের ৩৭.৩ ভাগ খানা প্রধানের কোন শিক্ষা নেই। কেবলমাত্র স্বাক্ষর করতে পারে এমন খানা প্রধানের সংখ্যা শতকরা ১৮.০ ভাগ। ১ থেকে ৫ বছরের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা রয়েছে এমন খানা প্রধানের সংখ্যা শতকরা ২৩.৭ ভাগ। শতকরা ১১.৭ ভাগের রয়েছে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা। কেবলমাত্র শতকরা ৯.৩ ভাগের রয়েছে একাদশ শ্রেণী বা তার বেশী পর্যায়ের শিক্ষা।

৩.৫. পেশা

পেশা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্যে দেখা গিয়েছে যে, শতকরা ৪৬.০ ভাগ খানা প্রধানের পেশা দিনমজুরী, মাছধরা, ভ্যান-রিক্সা চালনা। শতকরা ৩১.৭ ভাগ খানা প্রধানের

চিত্র- ৩ : খানা প্রধানের পেশা

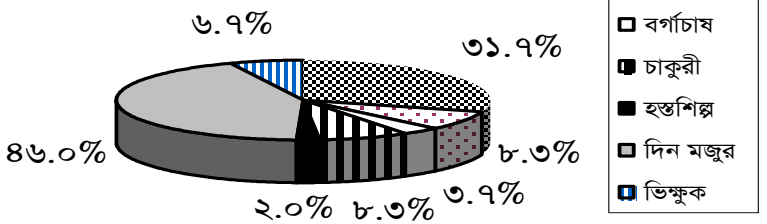

পেশা কৃষি। ক্ষুদ্র ব্যবসা আছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৮.৩ ভাগ, চাকুরীর কথা

উল্লেখ করেছেন একই সংখ্যক ব্যক্তি (৮.৩ ভাগ), অন্যের জমি বর্গাচাষ করেন এমন সংখ্যা শতকরা ৩.৭ ভাগ এবং ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করে এমন বলেছেন শতকরা ৬.৭ ভাগ খানা প্রধান। উপরোক্ত তথ্য থেকে সুস্পষ্ট যে, প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন পরিবারের খানা প্রধানের অর্থনৈতিক অবস্থান বিচার করলে তা খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থানের সূচক নয়।

৩.৬. আয়

আয়ের উৎস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে এজন্য যে, পারিবারিক আয় সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর যথেষ্ট প্রভাব রাখে। দেখা যায় যে, দিনমজুরী এবং ভিক্ষাবৃত্তিই অধিকাংশ খানা প্রধানেরই প্রধান আয়ের উৎস। পরবর্তী আয়ের উৎসের কথা বলা হয়েছে কৃষি (শতকরা ২৮ ভাগ), ক্ষুদ্র ব্যবসা ও চাকুরী যথাক্রমে শতকরা ৮.৩ ভাগ এবং ৭.৩ ভাগ জমি বর্গাচাষ করেন। হাঁসমুরগী পালন, হস্তশিল্পের মাধ্যমে আয় করেন খুব কম সংখ্যক, যথাক্রমে শতকরা ২.৩ ভাগ, ৩ ভাগ এবং শতকরা ১.০ ভাগ।

উপরোক্ত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন খণ্ডকালীন উৎস আছে কিনা এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে শতকরা ২৮.৩ ভাগ হ্যাঁসূচক উত্তর দিয়েছেন। তবে উল্লিখিত উৎস থেকে তা তেমন আলাদা উৎস বলে মনে হয়নি।

সারণী ২ : খানা প্রধানের বাৎসরিক আয়		
আয়	গনসংখ্যা	শতকরা হার
৮০০০ এর নিচে	৬৫	২১.৭
৮০০০ - ১২০০০	৯৮	৩২.৭
১২০০১ - ১৬০০০	৩৭	১২.৩
১৬০০১ - ২০০০০	২৮	৯.৩
২০০০১ এর উপরে	৭২	২৪.০
মোট	**৩০০**	
গড় আয়	**১৮০৫৮.৩৩**	

জরিপের সময় প্রতিবন্ধী পরিবার প্রধানের বাৎসরিক গড় আয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। খানা প্রধানের বার্ষিক গড় আয় পাওয়া গেছে ১৮,০৫৮·৩৩ টাকা; যা নিতান্তই কম। এ হিসেবে তাদের মাসিক গড়-আয় দাঁড়ায় মাত্র ১,৫০৪·৮৩ টাকা।

একটি ৪-৬ সদস্যবিশিষ্ট পরিবারে এ আয় প্রয়োজনের তুলনায় যে কত কম তা সহজেই অনুমেয়। শতকরা ২১.৭ ভাগ পরিবারের বার্ষিক আয় ৮ হাজার টাকার কম। শতকরা ৩২.৭ ভাগ পরিবারের আয় ৮ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা। ১২ হাজার থেকে ১৬ হাজার টাকা আয় করেন শতকরা ১২.৩ ভাগ পরিবার। অপরদিকে ১৬ হাজার টাকার উপরে কিন্তু ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত এবং ২০ হাজার টাকার উপর আয় করে যথাক্রমে শতকরা ৯.৩ ভাগ এবং ২৪.০ ভাগ পরিবার। দেখা যাচ্ছে যে, ৮ হাজার টাকা থেকে ১৬ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে শতকরা ৬৬.৭ ভাগ পরিবার। এ আয়কে অবশ্যই স্বল্পআয় বলতে হবে। এ আয়ে প্রতিবন্ধী সন্তানের চিকিৎসার ব্যয় সঙ্কুলান নিতান্তই কষ্টসাধ্য। একই কারণে অনেক পরিবারই স্বল্পআয়ের কারণে প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষা, চিকিৎসা বা প্রশিক্ষণ দিতে অসমর্থ।

৩.৭. খানা প্রধানদের সন্তান সংখ্যা

খানা প্রধানদের সন্তান সংখ্যার হিসেবে নেয়া হয়েছে, পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা এবং পরিবারের ধরন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য। খানার সদস্য সংখ্যা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ১৭.৭ ভাগের কোন ছেলে-সন্তান এবং ২০.৭ ভাগের কোন মেয়ে-সন্তান

চিত্র ৪: খানা প্রধানের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা

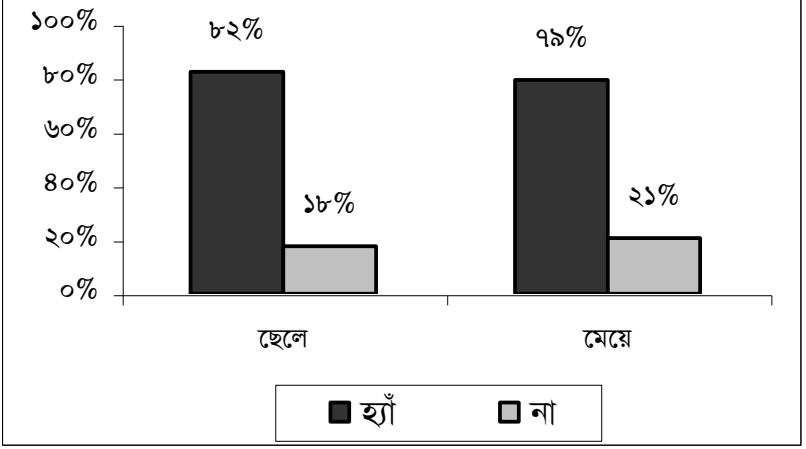

নেই। ১-২টি ছেলে রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৫৪.৩ ভাগ এবং একই সংখ্যক মেয়ে আছে বলে উল্লেখ করেছেন ৫৩.৩ ভাগ খানা প্রধান। তিন থেকে চার জন সন্তান রয়েছে বলেছেন শতকরা ২০.৩ ভাগ খানা প্রধান। চার বা ততোধিক ছেলে

এবং মেয়ে সন্তান রয়েছে প্রায় সমান সংখ্যক খানা প্রধানের, যথাক্রমে ৪.৩ এবং ৩.৭ ভাগের।

৩.৮. বাসস্থানের ধরন

অনেক সময় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং গবেষকরা এ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, বসবাসের পরিবেশের সাথে প্রতিবন্ধিতার সম্পর্ক বিদ্যমান। কেননা, অস্বাস্থ্যকর, স্বল্প পরিসরে বসবাসের পরিবেশ অনেক সময় দুরারোগ্য রোগের জন্ম দেয় এবং এখান থেকেই অনেকে প্রতিবন্ধিতার শিকার হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান যে, নমুনায় বাছাইকৃত শতকরা ৪৬.৭ ভাগ প্রতিবন্ধী রয়েছে এমন পরিবার ঝুপড়ি বা গোলপাতার ঘরে বসবাস করে। বাঁশ বা ছনের ঘরের কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৩৩ ভাগ। টিনশেড এবং পাকাবাড়ী রয়েছে এমন পাওয়া গেছে যথাক্রমে শতকরা ৮.৩ ভাগ এবং ৩.৩ ভাগ পরিবারের ক্ষেত্রে। অন্যের ঘরে আশ্রিত এমন পাওয়া গেছে শতকরা ৮.৭ ভাগের ক্ষেত্রে। অন্যের ঘরে আশ্রিতদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা যে খুবই করুণ তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

চিত্র ৫: বাসস্থানের ধরন

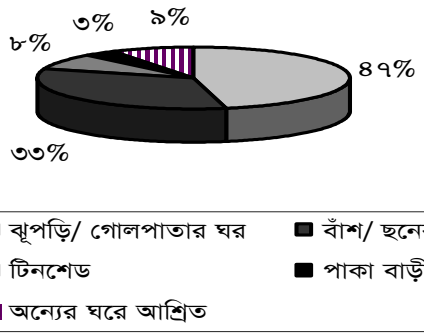

৩.৯. প্রতিবন্ধীর বয়স

গবেষণাকালে প্রতিবন্ধীর বর্তমান বয়স এবং যখন থেকে প্রতিবন্ধী হয়েছে সে সময়ের বয়স এবং প্রতিবন্ধিতার কারণ জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ০-৫ বছর বয়সের মধ্যে পাওয়া গেছে শতকরা ৩.৩ ভাগ। ১৬-১৯ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে শতকরা ২৭ ভাগ; পরবর্তী বেশী সংখ্যক প্রতিবন্ধী পাওয়া গেছে চল্লিশ বৎসর উর্দ্ধ বয়সের (শতকরা ১৯.৭ ভাগ) এবং পরবর্তী বেশী সংখ্যক পাওয়া গেছে ২৬ থেকে ৩৫ বছর

বয়সসীমার মধ্যে (শতকরা ১৬ ভাগ)। বয়স বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে, বেশীর ভাগ প্রতিবন্ধী ১১ থেকে ৪১ বছর বা তদূর্ধ বয়সের। সুতরাং অনেকে কৈশোর বা যৌবনে পদার্পণ করেছে বা অনেকের তরুণ বয়স ইতিমধ্যেই পার হয়ে গেছে। এরা অনেকেই পরিবারে অর্থনৈতিক বোঝা। অনেকেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, এদের অনেকের সম্ভাব্য পুনর্বাসন প্রয়োজন।

চিত্র ৬ : প্রতিবন্ধীর বর্তমান বয়স

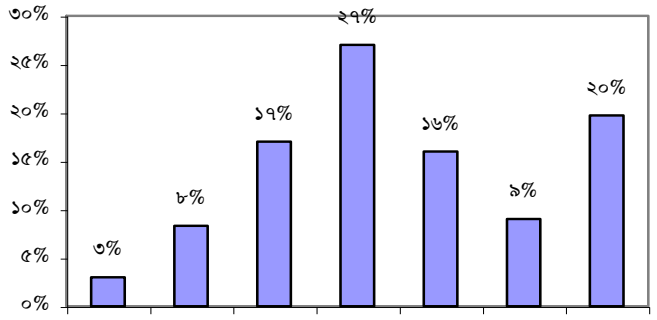

৩.১০ প্রতিবন্ধিত্বের বয়স

জরিপের সময় যখন থেকে প্রতিবন্ধী হয়েছে সে সময়ের বয়স জানার চেষ্টা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী হয়েছে শতকরা

চিত্র ৭ : প্রতিবন্ধীত্বের বয়স

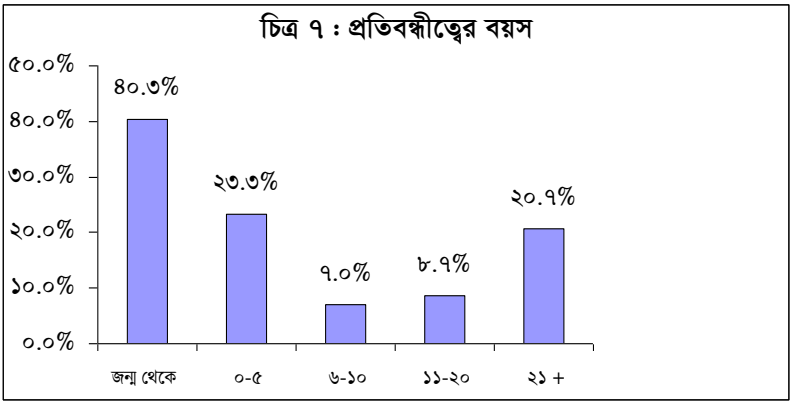

৪০.৩ ভাগ; জন্ম থেকে ৫ বছর বয়সের মধ্যে প্রতিবন্ধী হয়েছে শতকরা ২৩.৩ ভাগ;

৬ থেকে ২০ বছর বয়সসীমার মধ্যে প্রতিবন্ধী হয়েছে শতকরা ১৫.৭ ভাগ এবং বাকী শতকরা ২০.৭ ভাগ প্রতিবন্ধী হয়েছে ২১ বা তদূর্ধ বয়সে। জন্ম থেকে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এর কারণ সম্ভবত: মায়েদের অপুষ্টি, শিশুর অপুষ্টি, ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে বা অপ্রশিক্ষিত ব্যক্তির মাধ্যমে সন্তান প্রসব করানো বা ত্রুটিপূর্ণ লালন-পালনের কারণে সম্ভবত এত বেশী পরিমাণে প্রতিবন্ধী হয়ে থাকতে পারে।

৩.১১ প্রতিবন্ধিত্বের কারণ

জন্ম থেকে প্রতিবন্ধী হওয়া ব্যতিরেকে বিভিন্ন ধরনের কঠিন ব্যাধি থেকে শতকরা ৩৪.০ ভাগ, দুর্ঘটনা বা গাছ থেকে পড়ে প্রতিবন্ধী হয়েছে প্রায় এক-পঞ্চামাংশ

চিত্র ৮ : প্রতিবন্ধিত্বের কারণ

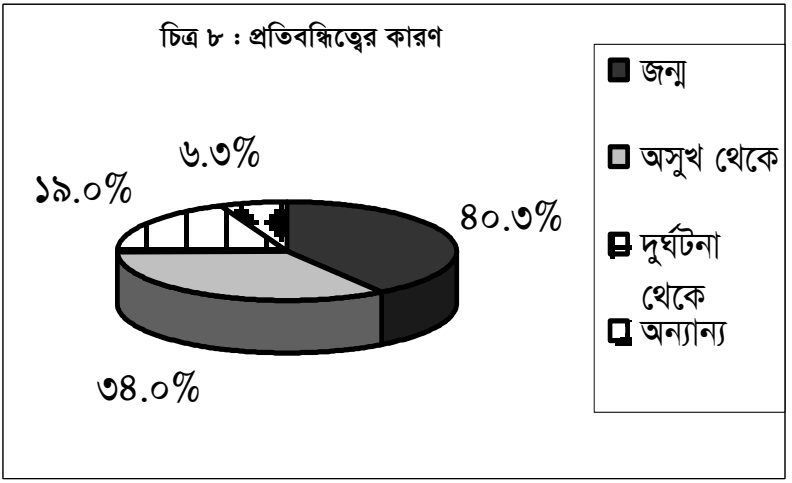

(শতকরা ১৯ ভাগ); চিকিৎসার অভাব, অপুষ্টি, সহিংসতা, রাজনৈতিক সন্ত্রাস, জমি সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি কারণে প্রতিবন্ধী হয়েছে শতকরা ৬.৩ ভাগ। প্রতি বছর বাংলাদেশে একমাত্র সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় ৪ হাজারের বেশী এবং পঙ্গুত্ব বরণ করে অথবা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এরচেয়ে ৬ থেকে ৮ গুণ বেশি লোক। বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধ বা এর উৎস কমিয়ে আনতে পারলে বাংলাদেশে অন্তত দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবন্ধিত্ব প্রতিরোধ সম্ভব অথবা প্রতিবন্ধীর সংখ্যা কমে আসবে।

৩.১২. প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা ও তাদের আগ্রহ

জরিপের নমুনায়নে যেসব প্রতিবন্ধীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের বিশেষ কোন দক্ষতা আছে কি নেই এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে জানা গেছে যে, কেবলমাত্র শতকরা ২৮.৩ ভাগের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে দক্ষতা রয়েছে। যাদের দক্ষতা আছে তাদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগের মাছধরার দক্ষতা, ১৮.৮ ভাগের রয়েছে গান গাওয়ার/ ছবি আঁকা এবং শতকরা ১৭.৭ ভাগের জালবোনার দক্ষতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য শতকরা ১৫.৩ ভাগ উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বাঁশ-বেতের কাজ, কাঠের কাজ, মাটির কাজ করার দক্ষতা রয়েছে। যাদের এসব দক্ষতা রয়েছে তারা পরিবারে কোন-না-কোন অবদান রাখতে সক্ষম। কিন্তু যাদের কোন দক্ষতা নেই তেমন প্রতিবন্ধী শতকরা ৭২ ভাগ। এরা পরিবারে কোন প্রকার অর্থনৈতিক অবদানই রাখতে সক্ষম নয়।

সারনী ৩ : প্রতিবন্ধীর দক্ষতা		
নির্দেশক	গনসংখ্যা	শতকরা হার
বুনন/ জালবোনা	১৫	১৭.৭
বাঁশ-বেতের কাজ/ কাঠের কাজ	১৩	১৫.৩
বিদ্যুৎ/ রেডিও/ টিভি মেরামত	২	২.৮
গান গাওয়া/ ছবি আঁকা	১৬	১৮.৮
মাছ ধরা	১৭	২০.০
খেলাধুলা	২	২.৮
অন্যান্য	৪৬	৫৬.১
মোট	**৮৫**	

প্রতিবন্ধীরা কি কি বিষয়ে আগ্রহী এ সম্পর্কিত তথ্য সরাসরি প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে এবং যেসব প্রতিবন্ধী সরাসরি উত্তর দিতে অক্ষম, সেসব প্রতিবন্ধীর পরিবারের সদস্যদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, শতকরা ৩৬.৭ ভাগ কিছু কিছু বিশেষ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছে তাদের আগ্রহের বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, লেখাপড়া করার ইচ্ছা (২৫.৫ ভাগ), সেলাইয়ের কাজ (১৩.৬ ভাগ), খেলাধূলা/ গান গাওয়া/ অভিনয় (১৫.৬ ভাগ), ক্ষুদ্র ব্যবসা/ দোকান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন (৪০.০ ভাগ)। অন্যান্য যেসব আগ্রহ বা ইচ্ছার কথা ব্যক্ত হয়েছে তাহল- টেকনিক্যাল কাজ শেখা যেমন বই বাইন্ডিং (৬.৪ ভাগ), চাকুরী/ শিক্ষকতা (৮.২ ভাগ), হাঁসমুরগী পালন ও রিক্সা/ ভ্যান/ নৌকা চালনা বা মেরামত করা (শতকরা ১.৮ ভাগ) ইত্যাদি। প্রতিবন্ধীদের আগ্রহের বিষয়গুলো থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে,

প্রতিবন্ধীরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। তারা চায়, কোন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে পেশাগত জীবনে নিয়োজিত হয়ে পরিবারের ভার লাঘব করতে এবং একই সাথে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে। প্রতিবন্ধীদের সাথে আলোচনার সময়ও তারা এ বিষয়টির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

সারনী ৪ : প্রতিবন্ধীর কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা		
নির্দেশক	গনসংখ্যা	শতকরা হার
লেখাপড়া করার ইচ্ছা	২৮	২৫.৫
হাঁস-মুরগী পালন	২	১.৮
সেলাইয়ের কাজ	১৫	১৩.৬
খেলাধুলা /গানগাওয়া/অভিনয়	১৭	১৫.৫
বাগান	৪	৩.৬
চাকুরী/শিক্ষকতা	৯	৮.২
ক্ষুদ্র ব্যবসা/ দোকান	৪৪	৪০.০
টেকনিক্যাল কাজ, বাইন্ডিং	৭	৬.৪
রিক্সা, ভ্যান, নৌকা চালনো	২	১.৮
মোট	**১১০**	

সন্তানের প্রতিবন্ধিতা দূর করার জন্য সাথে সাথে গৃহীত ব্যবস্থা: সন্তান যে কোন রোগ-শোকে প্রতিবন্ধী হচ্ছে বুঝতে পেরে এ ধরনের লক্ষণ চিহ্নিত করার সাথে সাথে সন্তানের প্রতিবন্ধিতার লক্ষণসমূহ দূর করার জন্য তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কিনা তা অভিভাবকদের কাছে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৫৩.৭ জনের পক্ষ থেকে হ্যাঁ সূচক উত্তর এসেছে। আর যাদের ক্ষেত্রে বা যেসব অভিভাবক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য সবচেয়ে বেশীসংখ্যক যে কারণের কথা উল্লেখ করেছেন তাহলো-'সচেতনতার অভাব'। শতকরা ৫৩.৬ ভাগ অসচেতনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং 'দরিদ্রতার' কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৩৯.৩ ভাগ। চিকিৎসার অভাবের কথা বলেছেন শতকরা ১০.৭ ভাগ। ওঝা, ফকির, তাবিজ, ঝাড়ফুঁকের কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৩.৬ ভাগ। প্রতিবন্ধিতা জন্মগত এবং তা কখনো ভাল হবে না বলে মনে করেছেন শতকরা ৭.১ ভাগ।

সারণী ৫ : সন্তানের প্রতিবন্ধিতা দূর করার জন্য সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ		
নির্দেশক	জনসংখ্যা	শতকরা হার
দরিদ্রতার জন্য	১১	৩৯.৩
চিকিৎসার অভাবে	৩	১০.৭
ফকির/ ওঝা/ঝাড়ফুঁক করা	১	৩.৬
সচেতনার অভাব, জানতাম না	১৫	৫৩.৬
জন্মগত এবং ভাল হবে না	২	৭.১
মোট	**২৮**	

৩.১৩. প্রতিবন্ধী কর্তৃক সংসারের কাজে সহায়তা প্রদান

প্রতিবন্ধীরা সংসারে কোন কাজে সহায়তা করে কিনা এ তথ্যও সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীরা নিজেদেরকে নিছক অর্থনৈতিক বোঝা মনে করে মানসিক কষ্ট অনুভব করে কিনা অথবা এ সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে জানা গেছে শতকরা ২৪ ভাগ প্রতিবন্ধী সংসারের কোন কাজে সহায়তা প্রদান করতে পারেনা; শতকরা ১১ ভাগ কাজ করেনা। সংসারের ছোটখাট কাজ করে শতকরা ৫০.৩ ভাগ। ভিক্ষা করে সংসার চালায় শতকরা ৮.০ ভাগ।

চিত্র ৯ : প্রতিবন্ধী কর্তৃক সংসারের কাজে সহায়তাদান

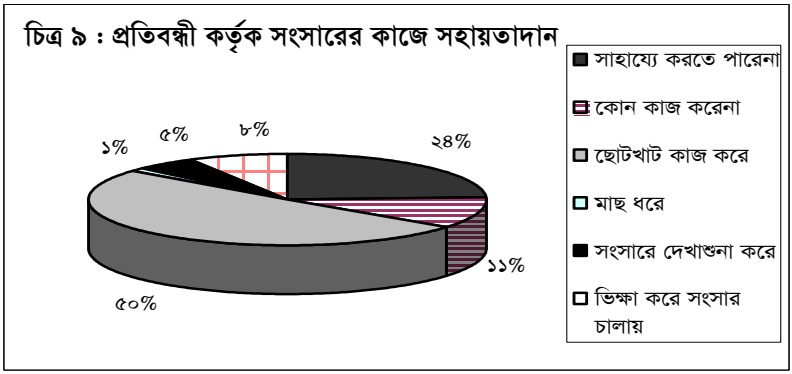

৩.১৪. প্রতিবন্ধীর প্রতি আচরণ

এ অধ্যায়ে প্রতিবন্ধীর প্রতি পিতামাতা, সংসারের অন্যান্য সদস্য এবং পাড়া প্রতিবেশীদের আচরণের ধরন অনুধাবনের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। কারণ, প্রতিবন্ধীদেরকে বা প্রতিবন্ধীর পরিবারকে করুণা করে, হেয় চোখে দেখে এমনকি প্রতিবন্ধিতা ঐ পরিবারের 'পাপের ফসল' বলেও অনেকে মনে করে। সুতরাং এ

প্রেক্ষিতে, প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণের ধরন অনুধাবন প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে বা তাদেরকে সমাজে সম্মানজনকভাবে বসবাসে সহায়ক হবে। আচরণ সম্পর্কিত তথ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পিতামাতার নিকট থেকে নেয়া হয়েছে এবং প্রতিবন্ধীর প্রতি আচরণ কিছুসংখ্যক মা এভাবে প্রকাশ করেছেন; 'আমার পেটের সন্তান, আমি তো অবহেলা করতে পারিনা'। একথা বলেছেন শতকরা ১৮.৭ ভাগ মা। তারা আরো বলেছেন যে, অবহেলিত বা লাঞ্ছিত হয় (১৩.৭ ভাগ), প্রতিবন্ধিতা অনেকে আল্লাহর ইচ্ছা বা নিয়তি বলে মেনে নিয়েছেন (শতকরা ২৬ ভাগ); অনেক পিতামাতা এও বলেছেন যে, পরিবারের কিছু কিছু সদস্য এবং সমাজের অন্যান্য লোক প্রতিবন্ধীকে অবহেলার চোখে দেখে এবং তাদের নাম থাকা সত্ত্বেও যারা খুঁড়িয়ে চলেন তাদেরকে ব্যঙ্গ করে ল্যাংড়া বা খোঁড়া, অন্ধদেরকে কানা, বাক প্রতিবন্ধীদেরকে বোবা বলে ডাকে। এ সময় মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বিপন্ন বোধ করেন। প্রতিবন্ধীর মনেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় বলে অভিভাবকগণ জানিয়েছেন। প্রতিবেশীদের বিরূপ মনোভাবের কারণেই অনেক অভিভাবক প্রতিবন্ধী সন্তানকে ঘরের বার করেন না অথবা প্রতিবন্ধীরা নিজেরাই বের হতে চাননা বলেও অনেক মা-বাবা জানিয়েছেন। প্রতিবেশীদের অপ্রীতিকর মন্তব্য প্রতিবন্ধীদের মানসিকভাবে আহত করে বলেও অনেক অভিভাবক দলগত আলোচনায় বলেছেন। আমরা জানতে পেরেছি যে, পরিবারের নিকট আত্মীয়রাও প্রতিবন্ধীদের ঘৃণা, উপেক্ষা বা অবহেলা করেন।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আচরণ সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা যত্নশীল এবং সহানুভূতিশীল এ সম্পর্কে বলেছেন শতকরা ৬৪ ভাগ। উপেক্ষা, অবহেলা বা দুর্ব্যবহার করে এমন কথা বলেছেন শতকরা ৩৪.৩ ভাগ।

প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারের সদস্যদের অবহেলার কারণে অনেক প্রতিবন্ধী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হীনমন্য বোধ নিয়ে জীবনযাপন করে। অথচ বিপরীত চিত্র দেখা যেতে পারে যদি অবহেলা প্রদর্শন না করে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সদয় আচরণ করা হয়।

৩.১৫. প্রতিবন্ধীর পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া

প্রতিবন্ধী পরিবারের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে বিবেচনা করার একটি মানসিক প্রবণতা যেমন প্রতিবন্ধীদের তেমনি অভিভাবকদের মধ্যেও প্রতিবন্ধী সন্তানকে মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি কাজ করতে পারে। এ উদ্দেশ্যেই এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৪৭ ভাগ প্রতিবন্ধী পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং শতকরা ৬৮.৩ ভাগ প্রতিবন্ধী জানিয়েছেন যে, তাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

চিত্র ১০ : প্রতিবন্ধীর পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

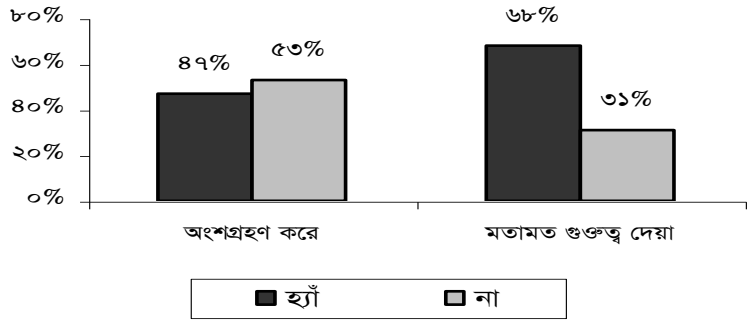

৩.১৬. প্রতিবন্ধীকে চিকিৎসা করানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

প্রতিবন্ধীদেরকে যথাযথ চিকিৎসা করানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এজন্য যে, অনেক ক্ষেত্রে যথাযথ চিকিৎসা বা সঠিক পরামর্শে অনেকে প্রতিবন্ধিত্বের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আবার অন্যদিকে

চিত্র ১১ : প্রতিবন্ধীদের প্রতি ডাক্তারের মনোভাব

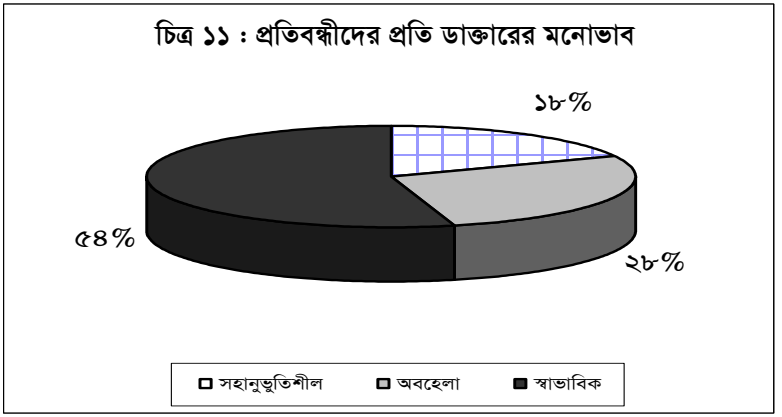

চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসা, বিরূপ আচরণ বা ভুল পরামর্শও প্রতিবন্ধিত্ব ডেকে আনতে পারে। সংগৃহীত তথ্য থেকে জ্ঞাত হওয়া গেছে যে, শতকরা ৭৬.৭ ভাগ প্রতিবন্ধীকেই চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

অনেক উত্তরদাতা বলেছেন যে, চিকিৎসকের কাছে নেয়ার পর অভিভাবকের মনে হয়েছে, শতকরা ১৮ ভাগ ডাক্তার যত্নশীল বা সহানুভূতিশীল ছিল, শতকরা ২৮ ভাগ ডাক্তার অবহেলা প্রদর্শন করেছে এবং অভিভাবকদের মতে, স্বাভাবিক আচরণ করেছে শতকরা ৫৪.০ ভাগ ডাক্তার। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু সংখ্যক চিকিৎসকরা প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আন্তরিক নন।

সারণী থেকে জানতে চেষ্টা করা হয়েছিল যে, প্রতিবন্ধীদের অভিভাবকদের মতে তার প্রতিবন্ধী সন্তান উপযুক্ত চিকিৎসা সুযোগ পেয়েছিল, না কি পায়নি! শতকরা ৬৫ ভাগই বলেছেন যে, তারা উপযুক্ত চিকিৎসা পেয়েছিল এবং যারা চিকিৎসা পায়নি তাদের কাছে চিকিৎসা না পাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা না পাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'আর্থিক অস্বচ্ছলতা (৮১.৩ ভাগ), সচেতনতার অভাব (২৬.৩ ভাগ) এবং ভুল চিকিৎসা পেয়েছে শতকরা ৭.৫ ভাগ। ভুল চিকিৎসা পাওয়ার পর আর তারা পরবর্তী চিকিৎসা নিতে যাননি বলেও অনেক অভিভাবক জানিয়েছেন।

সারণী ৬: প্রতিবন্ধী সন্তান উপযুক্ত চিকিৎসা না পাওয়ার কারণ		
নির্দেশক	জনসংখ্যা	শতকরা হার
আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য	৬৫	৮১.৩
সচেতনার অভাব	২১	২৬.৩
প্রথমে বুঝতে পারেনি	২	২.৫
ভুল চিকিৎসার ফলে এরকম হয়েছে	৬	৭.৫
এমন ধারণা ছিল, কবিরাজকে দেখালে ভালো হবে, কিন্তু হয়নি	২	২.৫

প্রতিবন্ধীদের জন্য বর্তমান যে বিদ্যমান চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে সে ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধীদের পিতামাতার মতামত নেয়া হয়েছে। তারা যে মত প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে, যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের জন্য রয়েছে তারচেয়ে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে (শতকরা ৯০.৭ ভাগ), গরিবদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে হবে (১৩.৩ ভাগ), ডাক্তারদের মধ্যে সচেতনতা এবং তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে (৮.০ ভাগ), অল্প খরচে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে (৫.৩ ভাগ) এবং পোলিও রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা করতে হবে। কোন প্রকার মতামতই প্রকাশ করেনি শতকরা ৪৪.১ ভাগ। এত বিপুল সংখ্যক উত্তরদাতা কোন প্রকার মতামত প্রকাশ না করার জন্য সম্ভবত: তাদের অসচেনতাই দায়ী।

যেসব স্থানে সাধারণত: চিকিৎসা দেয়া হয় সেসব চিকিৎসার স্থানসমূহের কথাও জানতে চাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উল্লেখ করেছেন সরকারি হাসপাতালের কথা (শতকরা ৬৮.৩ ভাগ)। পরবর্তীতে উল্লিখিত হয়েছে কবিরাজ ও ঝাড়ফুঁকের কথা (শতকরা ২২.৩ ভাগ)। বিদেশে চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেছেন শতকরা ৬ ভাগ। চিকিৎসার কোন কেন্দ্রের কথা জানেনা বলেছেনও সমান সংখ্যক উত্তরদাতা।

৩.১৭ প্রতিবন্ধীদের আয়-উপার্জন

প্রতিবন্ধীদের আয়-উপার্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা আমরা দেখেছি যে, প্রতিবন্ধীদের অনেকেই নিজেদেরকে পরিবারের বোঝা মনে করেন, অথবা পরিবারের অনেক সদস্য তা মনে করেন। আমরা বিশ্লেষণে দেখেছি যে, প্রতিবন্ধীদের পরিবারের গড় বাৎসরিক আয় একটি পরিবারের অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ প্রতিবন্ধী আয় করেন। অর্থাৎ বেশীরভাগ (৭০ ভাগ) প্রতিবন্ধীই আয় করেনা। আয় না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন শারীরিক অক্ষমতা (৪৩.১ ভাগ) এবং উপার্জনের বয়স হয়নি (শতকরা ২৪.৪ ভাগ) ইত্যাদি।

৩.১৮. প্রতিবন্ধীর পুনর্বাসন

প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন একটি জরুরি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। প্রতিবন্ধীদেরকে সমাজের বা পরিবারের অর্থনৈতিক বোঝা না ভেবে পুনর্বাসন করে তাদেরকে সম্মানজনক জীবন বা জীবিকা অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। তাই প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন একটি জরুরি মানবিক বিষয়ও। এজন্য কমিউনিটি-নির্ভর পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার উপর রাষ্ট্র এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছে।

চিত্র ১২ : প্রতিবন্ধী কর্তৃক উল্লেখিত পূর্ণবাসনের জন্য সহযোগীতা

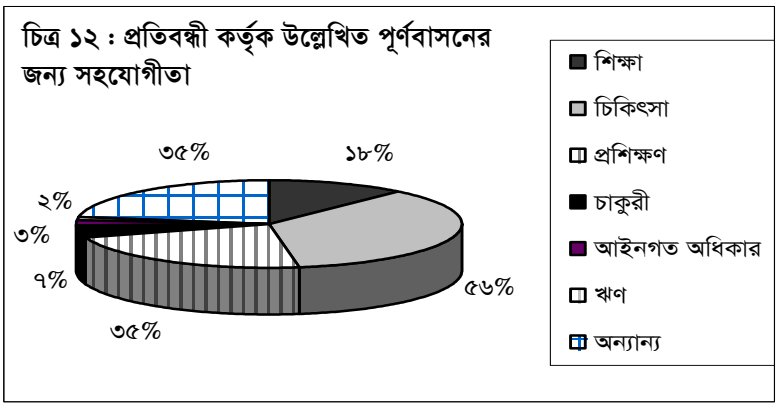

আর এ পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সফল হতে হলে প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি এবং প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে পুনর্বাসন সম্ভব নয়। জরিপকৃত ৩০০ জন প্রতিবন্ধীর মধ্যে মাত্র ১৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৫ ভাগ পুনর্বাসন প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এদের মধ্যে ৪০ জন বা শতকরা ১৩ জন বলেছেন যে, কোন ধরনের প্রশিক্ষণ নেয়ার বয়স তাদের হয়নি। ১৭ জন বা শতকরা ৬.৭ জনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই।

কি ধরনের পুনর্বাসন বা কি ধরনের সহযোগিতা তারা পেতে চান এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বেশীরভাগ বলেছেন যে তারা চিকিৎসা পেতে চান (শতকরা ৫৬ ভাগ), প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন (শতকরা ৩৫ ভাগ) এবং শতকরা ১৮.৩ ভাগ শিক্ষা পেতে চান বলে উল্লেখ করেছেন। চাকুরী, আইনগত অধিকার, প্রতিবন্ধী সন্তানের বিয়ে দিতে চান এবং ঋণপ্রাপ্তির কথাও স্বল্প সংখ্যক উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন।

সারণী ৭ : পুনর্বাসনের দায়িত্ব

নির্দেশক	জনসংখ্যা	শতকরা হার
সরকার	২৪৪	৮১.৩
এনজিও	১০	৩.৩
ইউনিয়ন পরিষদ	৩	১.০
সকলের	৩৩	১১.০
জানি না	১০	৩.৩
মোট	**৩০০**	

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, পুনর্বাসনের দায়িত্ব কে বহন করবে বলে তারা মনে করেন? বেশীরভাগ উত্তরদাতা বলেছেন যে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারের (৮১.৩ ভাগ), কমিউনিটির দায়িত্বের কথা বলেছেন শতকরা (১১.০ ভাগ), বেসরকারি সংস্থার দায়িত্বের কথা বলেছেন খুব কমসংখ্যক উত্তরদাতা (৩.৩ ভাগ) এবং একই সংখ্যক উত্তরদাতা এ দায়িত্ব কে বহন করবে তা তারা জানে না বলে জানিয়েছেন। বেসরকারি সংস্থা যে দেশে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, এ সম্পর্কে প্রতিবন্ধী পরিবারগুলো খুব কমই জানে বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকেও এ সম্পর্কে কম প্রচার-প্রচারণা করা হচ্ছে।

সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ বা অন্য কোথাও থেকে প্রাপ্ত সাহায্য: আমরা দেখেছি যে, প্রতিবন্ধী পরিবারের অর্থিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। সে ক্ষেত্রে এসব পরিবারের স্বাভাবিক প্রত্যাশা যে সরকারি কোন সংস্থা তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে। কিন্তু সারণী ১৩ থেকে প্রতীয়মান যে, শতকরা ১৪ ভাগ সাহায্য-

সহযোগিতার কথা বলেছেন এবং প্রায় একই সংখ্যক বলেছেন যে তারা মাঝে মাঝে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছেন। আর কোন ধরনের সাহায্য পাননি বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৭২.৭ ভাগ।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সরকার থেকে যে সাহায্য প্রতিবন্ধীর পরিবার পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল VGF কার্ড (২৪ ভাগ) মাঝে মাঝে চাল/ গম সাহায্য হিসেবে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা

চিত্র ১৩ : ইউ.পি বা সরকার থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ধরন

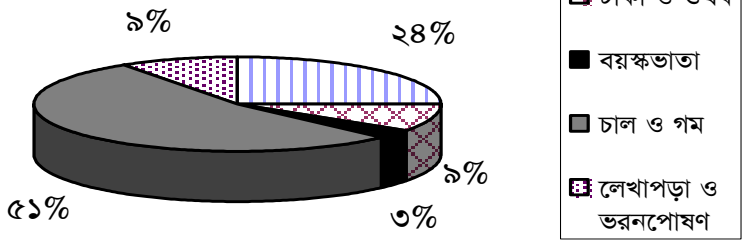

৫১.২ ভাগ; খুব কম পরিমাণ টাকা বা ঔষধ সাহায্য হিসেবে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৯ ভাগ এবং প্রতিবন্ধী স্কুলে বিনাখরচে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন শতকরা ৯ ভাগ অভিভাবক।

যেসব প্রতিবন্ধী পরিবার কোন ধরনের সাহায্য বা সহযোগিতা পায়নি তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে কেন তারা কোন প্রকার সাহায্য বা সহযোগিতা পায়নি? এদের মধ্যে শতকরা ৫৮.৩ ভাগ বলেছেন যে, সহযোগিতার জন্য তারা যোগাযোগ করেনি বা তাদের সাহায্যের কোন দরকার ছিল না; অপর এক-তৃতীয়াংশ (শতকরা ৩১.২ ভাগ) উত্তরদাতা বলেছেন যে, সরকারি সংস্থা বা ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্ব দেয় না। চেয়ারম্যান কোটারী স্বার্থের কারণে সাহায্য করেনি, শুধু দলীয় লোকদের এবং যে বাড়িতে ভোটার বেশি সেখানে সাহায্য করে। সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে ১০ ভাগই কোন তথ্য জানেন না বলে জানিয়েছেন।

৩.১৯. প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষা

জরিপকালে প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণ বা কারিগরী যে শিক্ষাই হোক না কেন তা একজন প্রতিবন্ধীকে সম্মানজনক জীবনযাপনে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষাজীবনের পরিধিকে বাড়াতে পারে, বাড়াতে পারে পেশার মান। আমাদের জরিপকৃত ৩০০ প্রতিবন্ধীর মধ্যে মোট ৪৫ জন

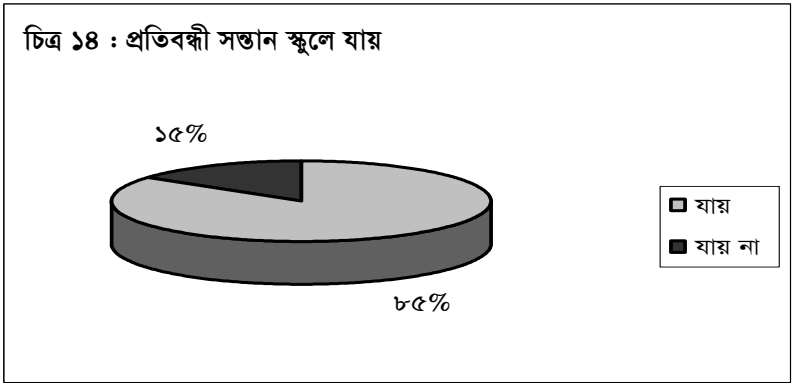

বিদ্যালয়ে যায় অর্থাৎ শতকরা ১৫ জনের শিক্ষা রয়েছে বলে জানিয়েছেন। যেসব প্রতিবন্ধীরা স্কুলে যায় না তাদের থেকে স্কুলে না যাওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশী উল্লিখিত কারণ হল, 'স্কুলের বয়স পার হয়ে গেছে' শতকরা ৩ ভাগ), তারপর উল্লিখিত কারণ হল, পড়াশোনা করার ব্যবস্থা নেই (৯ ভাগ), স্কুলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই অথবা একা একা স্কুলে যেতে পারে না (১২.১ ভাগ), প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার অভাব (২.৩ ভাগ) ইত্যাদি।

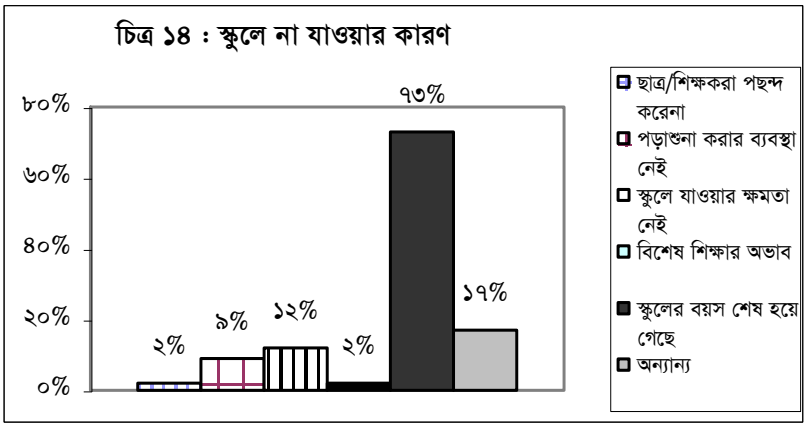

অবশ্য কখনো স্কুলে গিয়েছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ২৯.৪ ভাগ পূর্বে স্কুলে গিয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সহপাঠীদের আচরণের উপর অনেক প্রতিবন্ধীর শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাবেন কি যাবেন না তা নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রে সহপাঠীদের অবহেলা, অনাদর, উপেক্ষা বা দুর্ব্যবহারের কারণে প্রতিবন্ধীরা স্কুল পরিত্যাগ করেছেন বলেও জানা গেছে। সহপাঠীরা যত্নশীল বা সহানুভূতিশীল বলেছেন ৫০ জন প্রতিবন্ধী, ৪০ জন উপেক্ষা, অবহেলা, দুর্ব্যবহারের কথা বলেছেন। তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিরাট সংখ্যক প্রতিবন্ধী স্কুলে অবহেলার শিকার হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের স্কুলে কোন অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে সিংহভাগই বলেছেন যে, তারা অতিরিক্ত কোন সুযোগ-সুবিধা পান না। স্বল্পসংখ্যক উত্তরদাতা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন।

৩.২০. সরকার কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রণীত আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত জ্ঞান

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের সমস্যাকে চিহ্নিত করে এবং তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যদিও এ আইন এখন পর্যন্ত জাতীয় সংসদে পাশ হয়নি, কেবলমাত্র আইনের খসড়া প্রণীত হয়েছে। এ খসড়া আইনটি বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এখনও তা সংসদে পাশ হয়নি। প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধীর পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে জানার চেষ্টা করা হয়েছে, তারা এ সম্পর্কে অবহিত কিনা! কেবলমাত্র শতকরা ১.৭ জন এ সম্পর্কে অবহিত বলে জানিয়েছেন। সুতরাং বলা যায় যে, এ সম্পর্কে জনমনে এখনও সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি (চিত্র ১৬)

চিত্র ১৬: প্রতিবন্ধী আইন সম্পর্কে অবহিত

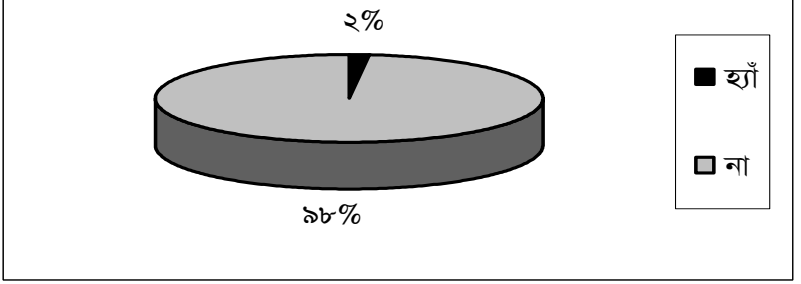

প্রতিবন্ধীর পরিবারে বা সমাজে সমান অধিকার ভোগ করা উচিত কিনা এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৩০.৭ ভাগ বলেছেন যে, প্রতিবন্ধীর সমান অধিকার ভোগ করা উচিত। অথচ সিংহভাগই 'নাসূচক' উত্তর দিয়েছেন। সমান অধিকার নিশ্চিত করার উপায়সমূহ কিভাবে বাড়ানো যায় এ সম্পর্কিত মতামতে উত্তরদাতারা বলেছেন যে, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে (৩৬.৭ ভাগ), সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে (২৫.৩ ভাগ) ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধীদের অধিকারের পরিধিকে বাড়িয়ে সমাজে এবং পরিবারে সমান অধিকার নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। দলগত আলোচনায় অনেক অভিভাবকই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণগত পরিবর্তন যত বেশী নিশ্চিত করা সম্ভব ততই প্রতিবন্ধীরা সামাজিক সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করে নিজেদেরকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ সদস্য বলে ভাবতে শুরু করবে।

৩.২১. প্রতিবন্ধিতা এবং উত্তরাধিকার

চিত্র ১৭: উত্তরাধিকার সূতে মালিকানা

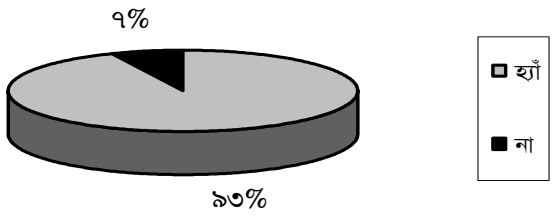

প্রতিবন্ধীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে উত্তরদাতারা কি ভাবেন তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা, অনেক প্রতিবন্ধীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এজন্য যে, তারা সম্পত্তি ভোগ-দখল করতে পারবে না। এমন ভ্রান্ত ধারণা অনেকেই পোষণ করে থাকতে পারেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রতিবন্ধী সন্তান সম্পদের মালিক হতে পারে কিনা, এ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতাদের সিংহভাগ (৯৩%) বলেছেন যে, উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হতে পারে (সারণী ১৫)।

মালিক না হতে পারার কারণ সম্পর্কে প্রতিবন্ধীরা বা তাদের অভিভাবকরা মনে করেন, সম্পত্তি ভোগ করতে না পারার কারণে।

৩.২২. প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ

প্রতিবন্ধীরা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হন। নিজ পরিবারে, পরিবারের বাইরে এবং সামাজিক জীবনে। এ প্রতিবন্ধকতা মানসিক এবং শারীরিক। প্রতিবন্ধী বা প্রতিবন্ধীর অভিভাকরা কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হন তা জানতে চাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সারণী ১৭ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৯৭ ভাগই বলেছেন, চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। অন্যান্য যে যে সমস্যার কথা উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে-সাধারণ জনগন বিরূপ চোখে দেখে (৫৬.৯ ভাগ)। অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধিতাকে সাধারণ জনগণ সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে দেখেন না। এটা তাদের মনোকষ্টের প্রধান কারণ। অতপর যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা হল-নিজের চলার ক্ষমতা নেই; শতকরা ৩৬.৫ ভাগ এমন কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাদেরকে চলাফেরার জন্য সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বাসে নিতে চায় না (শতকরা ১৫.৪ ভাগ) এবং বাসের যাত্রীরা পছন্দ করে না (১৪.৬ ভাগ) এবং একা একা প্রতিবন্ধীকে কোথাও পাঠাতে প্রতিবন্ধীর অভিভাবকরা ভয় পান (শতকরা ১৭.৬ ভাগ)।

প্রতিবন্ধী নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজে করতে পারে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে শতকরা ৬০ ভাগ প্রতিবন্ধী জানিয়েছেন যে, তারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ তারা নিজেরাই করতে পারে।

৩.২৩. প্রতিবন্ধী সন্তানকে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া এবং বাহিরে চলাফেরা

চিত্র-১৮: সামাজিক অনুষ্ঠানে না নিয়ে যাওয়া কারণ

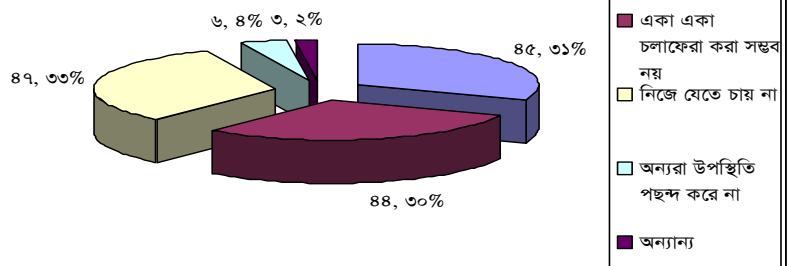

প্রতিবন্ধীর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অন্য সাধারণ সুস্থ মানুষের মত চিত্তবিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধীদেরকে সামাজিক কোন আচার-অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়না। এরা কারণ সম্ভবত বিড়ম্বনা,

লোকলজ্জা বা প্রতিবন্ধীকে সহানুভূতির চোখে না দেখা ইত্যাদি রয়েছে। অভিভাবকদের কাছে এ বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে বলা হয়েছে যে, শতকরা ৩৪.৭ ভাগ বলেছেন, তারা তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। শতকরা ৬৫.৩ ভাগই তাদেরকে নিয়ে যান না। যারা নিয়ে যান না তাদের কাছে না নিয়ে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে বেশীরভাগই বলেছেন যে, প্রতিবন্ধী নিজে যেতে চায় না, সংকোচবোধ করে (শতকরা ৪৭.০ ভাগ), অভিভাবকেরা নিজেরা নিয়ে যেতে সংকোচবোধ করেন (৪৪.০ ভাগ) এবং প্রতিবন্ধী একা একা চলাফেরা করতে পারেন না বলে তাদেরকে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে অভিভাবকরা নিয়ে যান না (৪৪.৪ ভাগ)। অনেকে প্রতিবন্ধীকে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে না যাওয়ার কারণ অন্যরা সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি পছন্দ করে না।

এমতাবস্থায় প্রতিবন্ধীর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয় এবং বাড়ির বা পরিবারের সবাই যখন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যায় তখন প্রতিবন্ধী কোথায় অবস্থান করে, কে তার দেখাশোনা করে, এ সময় প্রতিবন্ধীর মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিভাবকদের বেশিরভাগই বলেছেন যে, প্রতিবন্ধী একা একা থাকে (৫৭.১ ভাগ), বাড়িতে থাকে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্নাকাটি করে (শতকরা ২৭.৬ ভাগ), বাড়িতে মা-বাবার কাছে থাকে (শতকরা ১৮.৯ ভাগ)।

সারণী ৮ : প্রতিবন্ধীদের বাহিরে চলাফেরা		
ক. প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে কখনও বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়েছে		
নির্দেশক	জনসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮৪	৯৪.৭
না	১৬	৫.৩
খ. না যাওয়ার কারণ		
সংকোচবোধ করে	৬	৩৭.৩
অন্যরা তার উপস্থিতি পছন্দ করে না	৪	২৫.০
তার চলাফেরার ক্ষমতা নেই	৭	৪৩.৮
মোট	১৬	
গ. প্রতিবন্ধী বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশতে পারে		
হ্যাঁ	১৩৫	৪৫.০
না	১৬৫	৫৫.০

অথচ দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার চেয়ে মা-বাবারা তাদেরকে নিয়ে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়া পছন্দ করেন। কারণ এমন

হতে পারে যে, সামাজিক অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনের কাছে লজ্জা বা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। অন্যদিকে বেড়াতে যাওয়ায় এ ধরনের ঘটনা কম ঘটে বা একেবারেই ঘটার সম্ভাবনা নেই। বেশিরভাগ অর্থাৎ শতকরা ৯৪.৭ ভাগই বলেছেন যে, তাদের সন্তানদেরকে বেড়াতে বাইরে নিয়ে যান। আর যে স্বল্পসংখ্যক মা-বাবা প্রতিবন্ধী সন্ত ানদেরকে কেন বাইরে নিয়ে যান না, জানতে চাওয়া হলে তারা বলেছেন, প্রতিবন্ধীরা নিজেরা চলাফেরা করতে পারে না এবং সংকোচবোধ করেন এবং অন্যরা প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি পছন্দ করে না বলেই তাদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না। আমাদের জরিপকৃত প্রতিবন্ধীদের শতকরা ৪৫ ভাগ বন্ধুবান্ধবদের সাথে মিশতে পারে। (সারণী ৮)।

৩.২৪. প্রতিবন্ধীর নাগরিক অধিকার

নাগরিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম অধিকার হল নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার। জরিপকৃত প্রাপ্ত তথ্যে প্রতিবন্ধীদের মধ্যে শতকরা ৮০.৯ ভাগ ভোটার হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং যারা ভোটার হয়েছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৮৩.৫ ভাগ গত সাধারণ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন। প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ভোটার হওয়া এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের বা তাদের পরিবারের উদ্যোগ সন্তোষজনক।

সারণী : ৯ : (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য) প্রতিবন্ধী ভোটার হওয়া সম্পর্কিত		
নির্দেশক	জনসংখ্যা	শতকরা হার
ক. ভোটার হয়েছে		
হ্যাঁ	১৭০	৮০.৯
না	৪০	১৯.১
মোট	২১০	
খ. সর্বশেষ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ		
হ্যাঁ	১৪২	৮৩.৫
না	২৮	১৬.৫
মোট	১৭০	

৩.২৫. প্রতিবন্ধীদের বৈবাহিক অবস্থা

প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবন্ধীর ধারণানুযায়ী যৌনজীবন যাপনের ইচ্ছা অন্যান্য সাধারণ সুস্থ মানুষের মত তাদের মধ্যেও জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। আর এ জৈবিক প্রয়োজন যে অস্বাভাবিক কিছু নয় তা সমাজের অনেক সদস্যই মানতে রাজী নয়। এ মানসিকতার কারণে অনেক প্রতিবন্ধীর বিবাহবন্ধনে

আবদ্ধ হওয়ার মত স্বাভাবিক অবস্থা থাকা সত্ত্বেও সমাজের এবং পরিবারের সদস্যদের যথাযথ সহানুভূতিসম্পন্ন মনোভাব না থাকার কারণে অনেকেই যৌনজীবন যাপন থেকে বঞ্চিত থাকছে। আমাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, শতকরা ৪২ ভাগ প্রতিবন্ধীর বিবাহের বয়স হয়েছে। বিয়ের বয়স হয়েছে এমন প্রতিবন্ধী নারী-পুরুষের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ ও আচরণ অনুধাবনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৬০ ভাগ প্রাপ্ত- বয়স্ক অবিবাহিত প্রতিবন্ধী বিয়ের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শতকরা ৮.৩ ভাগ শারীরিক অক্ষমতার জন্য বিয়ে করতে চান না। অনেক প্রতিবন্ধীর বিয়ের আগ্রহ আছে কিন্তু প্রতিবন্ধিতার জন্য অবহেলার আশঙ্কায় অনেকেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী

চিত্র- ১৯ : স্বামী/ স্ত্রী প্রতিবন্ধীদের প্রতি আচরণের ধরন

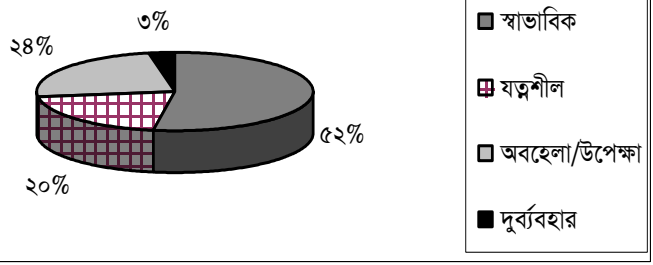

নয়। শতকরা ১৮ ভাগ বিয়ের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি।
বিয়ের বিষয়ে পাত্র-পাত্রী পক্ষের আচরণের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য পাত্র-পাত্রীর জন্য কোন প্রস্তাব আসে না, প্রতিবন্ধিতার কারণে ভালো পাত্র-পাত্রী পাওয়া যায় না, অনেক অভিভাবক বলেছেন যে, মোটা টাকার বিনিময়ে হয়তবা পাত্রস্থ করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় বিবাহিত প্রতিবন্ধী দম্পতি একে অপরের প্রতি কেমন আচরণ করে সে বিষয়ে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বাভাবিক আচরণ করার কথা বলেছেন শতকরা ৫২.০ ভাগ, একে অপরের প্রতি যত্নশীল বলেছেন শতকরা ২০ ভাগ, অবহেলা বা উপেক্ষার কথা বলেছেন শতকরা ২৪ ভাগ, দুর্ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন শতকরা ৩.২ ভাগ।

আবার যেসব প্রতিবন্ধী পিতামাতার সন্তান রয়েছে সেসব পিতামাতা সন্তানদের প্রতি কেমন আচরণ করেন এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানদের আচরণ কেমন সে বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভালো আচরণ ও ভালো

ব্যবহার করে শতকরা ৫৫.৯ ভাগ। অনেকে বলেছেন যে, ছেলেমেয়েরা সকলেই মা-বাবাকে ভালবাসে। অবশ্য কিছুসংখ্যক বলেছেন যে, মা-বাবা প্রতিবন্ধী হওয়ায় অনেক সময় সন্তানরা মা-বাবাকে উপেক্ষা করে। এছাড়াও সন্তানরা প্রতিবন্ধী পিতামাতার জন্য অসহায়বোধ করেন বলে জানা গেছে। ছেলেমেয়েরা প্রতিবন্ধী মা-বাবাকে দেখাশোনা করেন বলেও অনেকে জরিপকালে জানিয়েছেন।

অধ্যায়-৪
জীবনালেখ্য (কেসস্টাডি)-এর আলোকে বিশ্লেষণ

আমাদের বর্তমান গবেষণাকর্মে ২০টি কেসস্ট্যাডি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিশটি কেসস্ট্যাডি যদিও ২০ জনের চিত্র, তবুও এখানে এমন কিছু অনুভূতি, আবেগ, উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা বিধৃত হয়েছে যা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার প্রতিবন্ধীদেরও প্রতিনিধিত্বশীল হতে পারে। সংগৃহীত কেসস্ট্যাডি থেকে আমরা কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে পারি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: কুসংস্কারজনিত কারণে সন্তানের চিকিৎসা করানো হয়েনি; একই কারণে কোন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা না করিয়ে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবজের আশ্রয় নেয়া হযেছে; আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং সচেতনতার অভাবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। প্রতিবন্ধিতাকে নিয়তি বলেই অনেকে আপোষ করেছে এবং শুরুতেই তা করে অনেকেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়নি। এ নিয়তিমুখীতায় অনেকেই চরম প্রতিবন্ধিতায় রূপান্তরিত করেছে। নিয়তি-নির্ভরশীলতার ফলশ্রুতি অনেক অভিভাবকই অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বা এর পরিণাম আঁচ করতে পারেননি।

৪.১. শিক্ষা

প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে রয়েছে চরম অনীহা। কেননা যে সমাজে দরিদ্র পিতামাতার সুস্থ স্বাভাবিক সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে নানা কারণে রয়েছে অনীহা, সেখানে প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষার কথা না ভাবাই অনেকটা স্বাভাবিক সামাজিক প্রবণতা। অথচ শিক্ষা বা ব্যবহারিক শিক্ষা প্রতিবন্ধীর জীবন বদলে দিতে পারে, ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে জীবন সংগ্রামে করে তুলতে পারে সাহসী। শিক্ষার অভাব স্বাভাবিক সুস্থ মানুষকেও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। সেখানে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অভাব তাদেরকে আরো বেশী করে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যদিও সরকারি নীতিমালার আওতায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ব্যাপকহারে সাধারণ বিদ্যালয়গুলোতে এ শিক্ষার অবকাঠামো গড়ে তোলা যায়নি। সুতরাং প্রতিবন্ধীরা বা তাদের অভিভাবকদের পক্ষে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের সন্তানের জন্য শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। উল্লেখ্য যে, শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীরা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায়ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অন্য প্রতিবন্ধী যেমন শ্রবণ, দৃষ্টি বা বাক প্রতিবন্ধীরা সে সুযোগ গ্রহণ

করতে পারে না। যেহেতু এ ধরনের স্থাপনা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শহরাঞ্চলে অবস্থিত, গ্রামাঞ্চলে নেই, সেহেতু অধিকাংশ উল্লিখিত ধরনের প্রতিবন্ধীরা যেকোন ধরনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। পল্লী এলাকায় বসবাসকারী শ্রবণ, বাক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ একটি জরুরী বিষয় হওয়া উচিত। অন্যদিকে আরও একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, অনেক অভিভাবকই তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদেরকে দেশে প্রচলিত মূলশিক্ষা ধারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করা যে সম্ভব তা তাদের আদৌ জানা নেই। অথবা যেকোনভাবেই হোক না কেন অভিভাবকরা তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা, অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে কমিউনিটির লোকজন, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এমনকি শিক্ষকরা পর্যন্ত প্রতিবন্ধীদের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করেন না বলে অনেক প্রতিবন্ধী 'মানসিকভাবে আহত' হয়ে শিক্ষাক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। কমিউনিটির লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সহানুভূতিশীলতা এবং সহযোগিতামূলক আচরণ প্রতিবন্ধীদেরকে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এমনকি প্রতিবন্ধীরা উৎসাহ-উদ্দীপনা পেলে সমাজের অন্যান্য স্বাভাবিক সুস্থ নাগরিকের মত বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

৪.২. কর্মসংস্থান

শিক্ষার পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের আর একটি হতাশাজনক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে। এমনিতেই দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় কর্মসংস্থানের রয়েছে তীব্র সংকট, সেক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি অবহেলিত থাকবে তা অনেকটা স্বাভাবিক। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, প্রতিবন্ধীদের রয়েছে অদম্য কাজের ইচ্ছা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য, পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির গভীর আকাঙ্খা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সুযোগ প্রতিবন্ধীরা পাচ্ছে না। অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদেরকে প্রতিবন্ধী বলে নিয়োগকারীরা নিয়োগ দিতে ইচ্ছুক না। আবার নিয়োগ করলেও তাদের প্রতি মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় (দেখুন ইকবালের অদম্য ইচ্ছা শীর্ষক কেসস্ট্যাডি)। শারীরিকভাবে সক্ষম প্রতিবন্ধীদেরও মূলধন, উৎসাহ, পারিবারিক পরিবেশের অভাবের কারণে আয়মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

৪.৩. আবেগপ্রবণতা; প্রেম, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন

ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশের প্রবণতা মানুষমাত্রেরই সহজাত ধর্ম। প্রতিবন্ধীদেরও এ প্রবণতা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। বাক, দৃষ্টি, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের মধ্যেও এ প্রক্রিয়া সমানভাবে কাজ করে। যারা বাক, দৃষ্টি এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী নয় তাদের ক্ষেত্রে এ আবেগ প্রকাশ তুলনামূলকভাবে সহজতর। আর যারা এ তিন ধরনের প্রতিবন্ধিত্বের

শিকার তারা তাদের উদ্বেলিত আবেগ ভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকেন। বিখ্যাত রুশ লেখক ইভান তুর্গেনিভের 'মুমু' গল্পের বাক প্রতিবন্ধী প্রধান চরিত্র 'গেরাসিমভ' যেমন প্রকাশ করেছিল তার মনের আকুতি দয়িত তাতিয়ানার প্রতি, প্রতিবন্ধীদের আবেগ প্রকাশের এটি একটি চিরায়ত উদাহরণ। কিন্তু আমাদের মত অনুন্নত একটি সমাজ ব্যবস্থা যেখানে দারিদ্র, অশিক্ষা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির মানসিক শক্তি সহজভাবে বিকশিত হতে পারে না বা ব্যক্তিগত আবেগপ্রবণতা এখনও 'হেয় চোখে দেখা হয়'। এমনি এক সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধীদের মানসিক ও ব্যক্তিগত আবেগ চরম উপেক্ষিত হবে এ হয়তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। প্রতিবন্ধিতার কারণে দাম্পত্য জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে, ব্যক্তিগত আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে যুবক লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রতিবন্ধিতার কারণে জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপরিচিত যুবকের সাথে যৌতুকের বিনিময়ে কন্যার বিয়ে দিয়েছেন পিতা। প্রতিবন্ধীরা কোন কোন ক্ষেত্রে মৌখিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার। প্রতিবন্ধী ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে গিয়ে বা তাকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার জন্য এক প্রতিবন্ধীর বোন এলাকার যুবকদের অশ্লীল মন্তব্যের শিকার হন। এতে সে যেমন মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যদিকে আরো তীব্র মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয় তার বোনও। এভাবে সমাজ প্রতিবন্ধীর পরিবার বা তার সদস্যদেরকে সহযোগিতা না করে তাদেরকে মানসিকভাবে নির্যাতনই করে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের মানবিক অনুভূতি প্রকাশ, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া তাদের অবর্ণনীয় মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবন্ধীতার কারণে দাম্পত্য জীবনে যখন বিড়ম্বনা দেখা দেয় তখন প্রতিবন্ধীরা নিজেদেরকে অসহায় মনে করে এবং তারাও ক্রমে ক্রমে মানবিক গুণাবলী হারিয়ে ক্রমশ: হয়ে ওঠে রুঢ়। তারা সমাজ, মানুষ ও পারিপার্শ্বিকতার উপর বিশ্বাস হারিয়ে মানসিকভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

অনেক সময় পরিবারের লোকজনও প্রতিবন্ধীদের প্রতি সদয় আচরণ করে না। এর হয়তো একাধিক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত: দারিদ্র এবং আর্থিক অনটন পরিবারের সদস্যদের ভাবতে শেখায় যে প্রতিবন্ধী সংসারের বোঝা। দ্বিতীয়ত: প্রতিবন্ধীর জন্য পরিবারের সময় এবং সম্পদ ব্যয়িত হচ্ছে যা অপচয়ের সামিল এবং তৃতীয়ত: পরিবারের অনেকেরই প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব না থাকার কারণে মানসিকভাবে তাদেরকে গ্রহণ করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে, প্রতিবন্ধীরা নিজেদের পরিবারের অভ্যন্তরেই তীব্র মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। এ ধরনের আচরণ বেশী পরিলক্ষিত হয় মেয়ে প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী সন্তান যে পরিবারে রয়েছে সে পরিবারের প্রতি প্রতিবেশীদের আচরণও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিবেশী এমন কি আত্মীয়স্বজনরা পর্যন্ত প্রতিবন্ধিত্বের জন্য মা-বাবাকে দায়ী করেন। প্রতিবেশীরা প্রায়ই মনে করেন যে, মা-

বাবার কোন পূর্ব পাপের ফসল এ সন্তান। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এদোষ সম্পূর্ণরূপে চাপানো হয় মায়ের উপর। কেননা, মা সন্তান গর্ভে ধারণ করেন বলেই সম্ভবত: দায়দায়িত্ব মায়ের উপর চাপানো হয়। প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের এমন আচরণের ফলে প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে এমন পরিবারটি সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে। অথচ আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা সামান্য সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও প্রতিবন্ধীর পরিবারটি আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে বেশি আগ্রহী হয়।

৪.৪. শারীরিক, মানসিক ক্ষতিসাধন

প্রতিবন্ধীদের প্রতি রূঢ় আচরণ, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার, যৌন হয়রানি ইত্যাদি অনেক সময় পরিবারে অভ্যন্তরে অথবা প্রতিবেশীদের দ্বারাও সংঘঠিত হতে পারে। এসব ঘটনায় দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অনেকেই আইনি সহায়তা নেন না বা পান না। এতে প্রতিবন্ধীরা এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং এ সামাজিক অনিরাপত্তা অর্থনৈতিক অনিরাপত্তাকে আরো বহুগুনে বাড়িয়ে তোলে। শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের মধ্যে রয়েছে মারপিট করা, প্রতিবন্ধীদেরকে লুকিয়ে রাখা, শাস্তি প্রদান বা পর্যাপ্ত খাবার এবং পরিধেয় বস্ত্র না দেয়া বা নোংরা, পুরনো কাপড় পরিধানে বাধ্য করা ইত্যাদি। অনেক সময় নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী যারা কপট সাহায্য-সহানুভূতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী মেয়েদেরকে যৌন হয়রানি করে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত: পিতামাতারা কোন উচ্চবাচ্য করেনা। কারণ শেষ পর্যন্ত দোষ চাপানো হয় প্রতিবন্ধীর উপর, অপরাধীর উপর নয়।

আমরা দেখেছি কিভাবে হিংসাত্মক কার্যকলাপ একজন সুস্থ মানুষকে প্রতিবন্ধিতায় ঠেলে দেয়। স্বার্থান্বেষী মহল কিভাবে অন্যকে ব্যবহার করে! পরবর্তীতে হিংসা, হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পঙ্গু বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি তারা কিভাবে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে, কেসস্ট্যাডিতে বর্ণিত পা-হারা হারুণ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪.৫. প্রতিবন্ধীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং স্বাভাবিক শারীরিক বর্ধন

আলোচনায় প্রতিভাত হয়েছে যে, কোন মা-বাবাই ছেলে-মেয়েদের সাথে তাদের স্বাভাবিক শারীরিক বর্ধন ও পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে মেয়েদের শারীরিক যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সে সম্পর্কে কোন আলোচনাই করে না। সুতরাং এ সম্পর্কিত ধারণা না দেয়া এবং তাদের নিজস্ব প্রক্রিয়ায় জ্ঞান আহরণের কোন উপায় না থাকায় তারা মানসিক অপ্রস্তুতিজনিত কারণে অস্বাভাবিক অবস্থার সম্মুখীন হন এবং মানসিকভাবে আহত বা অসহায়বোধ করেন।

৪.৬. প্রতিবন্ধীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া

প্রতিবন্ধীদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুবই তীব্র। যারা বাক প্রতিবন্ধী নয় তারা তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। প্রতিবন্ধীদের এ প্রতিক্রিয়া অনেকগুলো সামাজিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ-নির্ভর। প্রতিবন্ধীর মানসিক অবস্থা বা মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে পারিবারিক গ্রহণযোগ্যতার উপর। পরবর্তীতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ও সামাজিক পরিবেশ তাদেরকে প্রভাবিত করে। যেসব পরিবারে প্রতিবন্ধীদেরকে যথাযথ যত্ন করা হয় তারা কম হতাশাগ্রস্ত, কম বিষণ্ন, বেশী জীবন-উচ্ছল। এসব প্রতিবন্ধীরাও পিতা-মাতার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত বুঝতে সক্ষম। অন্যদিকে, যেখানে অনাদর বা অবহেলা প্রদর্শিত হয় সেসব পরিবারের প্রতিবন্ধীরা ক্ষুব্ধ, অসন্তুষ্ট, বিষণ্ন বা অনিরাপত্তাজনিত অসহায়ত্বের অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত। এসব শিশুদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ বেড়ে ওঠে না বরং এরা হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। প্রতিবন্ধীরা যদি পারিবারিক বা সামাজিকভাবে মানসিক সহানুভূতি লাভ করে তাহলে তারাও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্য প্রদর্শন করতে পারে। প্রতিবন্ধীদের প্রতি অসম, অবহেলাপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন তাদের ব্যক্তিত্বের অবমাননা; তা সে তেমন ব্যবহার পারিবারিকভাবেই হোক বা অন্যকোন সামাজিক স্থান যেমন-স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, কর্মক্ষেত্র যেখান থেকেই দেখানো হোক না কেন প্রতিবন্ধীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে মূলত: প্রতিবন্ধীদের অনিরাপত্তার দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ মানুষের যে মূল মানবাধিকারের নিরাপত্তা তা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে চরমভাবে লংঘিত হতে আমরা প্রতিনিয়তই দেখি। তারা লাঞ্ছিত হয়েও আইনি সহায়তা থেকে বঞ্চিত। এ বঞ্চনার প্রধান কারণ, আমরা তাদের জন্য কোন আলোকিত বা প্রতিশ্রুতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে পারছি না। অনেক সময় নিজ পরিবারে প্রতিবন্ধীরা স্নেহ, ভালবাসা, প্রয়োজনীয় খাবার এবং পরিধেয় বস্ত্রের অভাবজনিত হীনমন্যতায় ভোগে। এ হীনমন্যতাবোধজনিত বঞ্চনাও মানবাধিকারের এক ধরণের লংঘন। পরবর্তীতে সমাজ এবং সামাজিক পরিবেশের ব্যবহার, অসম আচরণ, অশালীন এবং অবমাননাকর উক্তি, কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বলে কটাক্ষের শিকার এসবই মানবাধিকার লংঘনের শামিল। কিছু কিছু প্রতিবন্ধী এসব অবমাননাকর অবস্থা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চান। তারা সামাজিক প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ করে অসম বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অনেকেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। গবেষণা পরিচালনাকালে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের আকাঙ্খা ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন অনেক প্রতিবন্ধী।

অধ্যায়-৫
জীবনালেখ্য

লাকিয়ার ভাগ্য

লাকিয়ার বাড়ি পশ্চিম সায়েড়া গ্রামে। বাবার নাম আবু মুছা। দরিদ্রতার ছাপ তাদের বাড়িময়। টালি ও গোলপাতায় বানানো দুইখানা ঘর। দারিদ্রের কারণ হলো, তার বাবার দুইটি বিয়ে এবং সে কারণে দুই সংসার। দুই মায়ের মোট সন্তান সংখ্যা ১৩ জন।

লাকিয়ার বয়স ২৫ বছর। লাকিয়ার মা সংসারের বড় বউ এবং অন্য মা ছোট। লাকিয়ার মায়ের ৬ সন্তান। ৪টি ছেলে এবং ২টি মেয়ে। লাকিয়া সবার ছোট মেয়ে। সৎ মায়ের ছেলেমেয়ে তথা দুই মায়ের দুই পরিবারের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই।

লাকিয়া যখন ৪ বছরের তখন পোলিওর থাবা তার বাম পায়ের শক্তি শুষে নিয়েছিল। লাকিয়া নিজে এবং তার মা এখন বিশ্বাস করে যে 'ন্যাড়া বাতাস' অর্থাৎ 'বাও বাতাস' লেগেছে। তাই তার এ অবস্থা। স্থানীয় কবিরাজ বা ওঝা দেখানো হয়েছিল। কোন ডাক্তার দেখানো হয়নি। বর্তমানে যে পোলিও টিকা খাওয়ানো হয় তার কার্যকারিতা কি, তাও সে জানে না। একটা বাঁশের লাঠি এবং এক পা'র সাহায্যে অনেকটা ক্যাংগারুর মত করে চলাফেরা করতে হয় লাকিয়াকে।

লাকিয়া লেখাপড়া করার সুযোগ পায় নি। অন্য ভাইবোনেরাও করেনি। বড় বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই ৪টি ছোট। তা সত্ত্বেও তারা দিনমজুরি করে ও মাছ ধরে সংসার চালায়। কারণ বাবা তাদের সংসারের কোন খোঁজ-খবরই রাখে না।

দরিদ্র পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে সে কিরূপ জীবনযাপন করে, তার এক নমুনা হলো লাকিয়া। পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে মানুষ হিসেবে লাকিয়ার কোন মূল্য নেই। তার কাছে কোন সদস্য কোন বিষয়ে আলাপ করে না, জানতেও চায় না। কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার সুযোগও তাকে দেয়া হয় না।

সামাজিকভাবেও সে নানারূপ অবহেলার শিকার। কোন প্রতিবন্ধীর কাছে গেলে ভাল ব্যবহার পায় না। তা সত্ত্বেও তাকে লজ্জা-শরম ত্যাগ করে বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের কাছে যেতে হয়। অনেকটা কুকুর-বিড়ালকে যেভাবে মানুষ উচ্ছিষ্ট দেয়, সে

তেমনি সাহায্য পায়। প্রতিবন্ধী এবং অসহায় মানুষ হিসেবে কোন সাহায্য-সহানুভূতি কারো নিকট সে পায় না।

যখন তার বয়স ২০ বছর, তখন তার প্রতিবেশী চাচারা একটি ছেলেকে নিয়ে আসে লাকিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্য। তার চাচারা খুলনার একটি মিলে চাকুরী করে। ছেলেটিকে সেই মিল থেকেই নিয়ে এসেছিল। ছেলেটির কেবল নাম ছাড়া আর কোন পরিচয় বা বাড়িঘরের ঠিকানা কেউই জানত না। লাকিয়ার বাবা প্রতিবেশীদের কথায় রাজী হয়ে গেল। তার ধারণা, প্রতিবন্ধী মেয়েকে কোন ছেলে বিয়ে করতে চাইবে না। তাই যেনতেনভাবে পাত্রস্থ করতে পারলেই তার দায়মুক্ত হয়। লাকিয়াকে যখন ছেলেটির কথা জানানো হয়, তখন সে তার নাম, ঠিকানা ও পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু তার বাবা অথবা প্রতিবেশী চাচারা কেউই নাম শহিদুল ইসলাম ছাড়া আর কিছু জানাতে পারেনি। বিষয়টি লাকিয়ার কাছে অবমাননাকর মনে হয়েছিল। ঠিকানা-পরিচয়হীন একটি ছেলের সঙ্গে তার বাবা কেন তাকে বিয়ে দেবে! বিশেষ করে যে বাবা তাদের কোন খোঁজ-খবর নেয় না, সে কেন তার উপর অভিভাবকত্ব ফলাতে আসবে? তাহলে সে প্রতিবন্ধী বলেই কি এ অবস্থা? এক পর্যায়ে তার বাবা তাকে বলেই বসল, 'তোকে কে বিয়ে করবে যে তুই অমত করছিস?' জবাবে লাকিয়া জানায়, 'বাবা তুমি আমাকে এই গ্রামের চেনাজানা একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দাও। সে আমাকে দেখেশুনে বুঝে বিয়ে করলে হয়তো কখনও ছেড়ে যাবে না। আর ঠিকানা-পরিচয়হীন একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে আজ বাদে কাল ফেলে গেলে তোমার আমার কিছুই করার থাকবে না।'

দরিদ্র পরিবারে প্রতিবন্ধী সন্তান থাকলে সে কিরূপ জীবনযাপন করে, তার এক নমুনা হলো লাকিয়া। পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে মানুষ হিসেবে লাকিয়ার কোন মূল্য নেই। তার কাছে পরিবারের কোন সদস্য কোন বিষয়ে আলাপ করে না, জানতেও চায় না। কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ তাকে দেয়া হয় না।

এখন লাকিয়া বেঁচে আছে, 'সে শুধু বাবার পাপের ফসল' এমন ধারণা সম্বল করে। তার শেষ ভাবনা-যদি কখনো কারো কাছ থেকে সাহায্য পায় তাহলে আলাদা ভিটিতে নিজের মত করে একটি কুঁড়ে বাধবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে নিরবে নিঃশেষ করে দেবে। কোন প্রতিবাদ অথবা ক্ষোভ নেই কারো কাছে।

যথারীতি লাকিয়ার কথার মূল্য দেয়নি তারা। এক মধ্যরাতে এলাকার মৌলবী ডেকে তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হল। অনেকটা পাড়া-প্রতিবেশীদের না জানিয়ে গোপনে বিয়ে দেয়ার আয়োজন। রোজার মাস তখন শেষ হয়েছে। কিছুটা অসুস্থতা এবং দুর্বলতা নিয়ে সে রাতে লাকিয়া ঘুমিয়েছিল। তাকে ডেকে টেনে তুলে 'কবুল' বলতে বলা হয়। আজ লাকিয়া মনে করতে পারে না সে রাতে সে কবুল বলছিল কিনা! তবে স্মৃতি হাতড়ালে 'না-বোধক' উত্তরটাই উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়। শুরু হয় লাকিয়ার অসমর্থিত দাম্পত্য জীবন।

এক নবদম্পত্তির নতুন পরিবার সৃষ্টি হবার পর কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে পথচলা শুরু হয়। লাকিয়ার বিষয়টি হল সম্পূর্ণ বিপরীত। একেতো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, তার উপর যদি স্বামী তার যথাযথ দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে তার মানসিকতা কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। লাকিয়াও ভেবেছিল, তার স্বামীকে সে আস্তে আস্তে বোঝাতে পারবে অথবা নিজেকে বোঝাবে। দুটি মন একাত্ম হতেও সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বাদ পেতে হলে ন্যূনতম কিছুটা সময় প্রয়োজন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, স্বামীসুলভ কোন আচরণ অথবা দায়িত্ব পালন না করেই যেমন রাতের অন্ধকারে এসেছিল তেমনি এক রাতের অন্ধকারে কাউকে কিছু না বলেই বিয়ের ১৫ দিন পর পালিয়ে গেল। স্বামী বা সংসার বলতে যা বোঝায় তা বোঝার আর তার সুযোগ হয়নি। আর বোঝা হয়নি বলেই আজ ৫ বছর পরে এসে স্বামী সম্পর্কে কোন কথা বললে সে নিরুত্তর থাকতে পছন্দ করে। একান্তই কিছু বলতে বললে সে বলে, 'আমারতো বিয়েই হয়নি।' তার স্বামী চলে যাবার পর খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে সে নাকি ইতিপূর্বে বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বিয়ে করেছে এবং টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়েছে। ছাড়াছাড়ির প্রশ্নে লাকিয়া জানায়, যে পালিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে, সে ছাড়লেই বা কি আর থাকলেই বা কি? লাকিয়া বদ্ধপরিকর যে সে কখনো বিয়ের মত দুর্বিষহ জীবনে আর প্রবেশ করবে না। কারণ তার মত প্রতিবন্ধীদের জন্য বিয়ে নয়।

যেহেতু বাবা তাদের কোন খোঁজ-খবর রাখে না, আর ভাইয়েরা এখন পর্যন্ত আয় করতে পারে না। তাই লাকিয়ার যতটুকু যত্ন বা সহযোগিতা দরকার তা সে পায় না। তাইতো নিজের মত করে বাঁচতে চেষ্টা করে সে। পয়সার বিনিময়ে পাড়াপ্রতিবেশীর কাঁথা সেলাই করে। অন্যরা যে কাঁথা সেলাই করলে ৫০ টাকা পায়, সেখানে লাকিয়া পায় মাত্র ২৫/৩০ টাকা। লাকিয়া বাধ্য হয়ে তাই নেয়। তা না হলে তার কাপড়-চোপড়, সাবান, তেল ইত্যাদি কোথায় পাবে! আর কম মজুরি দেবার জন্য প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তার নেই। কারণ প্রতিবন্ধী হিসেবে সে আগে থেকেই অবহেলিত।

চলাফেরা করার ক্ষেত্রে একটি বাঁশের লাঠিকে সম্বল করেছে লাকিয়া। গোছল ও কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধা মা-ই তাকে সাহায্য করে। যখন মা থাকবে না, তখন কি হবে এ নিয়ে এখনও চিন্তা করে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর আর তার স্কুলে যাওয়া হয়নি। কারণ পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তার কথা তাকে কেউ বলেনি। মেঝ ভাই বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। মা অথবা তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। লাকিয়ার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই বলে সে জানায়। কারণ সে কখনো কোন আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যায় না বা তাকে নিয়ে যাওয়া হয় না।

এখন লাকিয়া বেঁচে আছে, 'সে শুধু বাবার পাপের ফসল' এ ধারণা সম্বল করে। তার শেষ ভাবনা যদি কখনো কারো কাছ থেকে সাহায্য পায় তাহলে আলাদা ভিটিতে নিজের মত করে একটি কুঁড়ে বাধবে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে নিরবে নিঃশেষ করে দেবে। কোন প্রতিবাদ অথবা ক্ষোভ নেই কারো কাছে, কারো বিরুদ্ধে।

প্রতিবন্ধী ভাইয়ের জন্য বোনের কষ্ট

বদোখালীর আল মামুনের কথা বলছি। সে একজন জন্ম প্রতিবন্ধী। সে মানসিক এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী। বয়স ১৫ বছর। চিকিৎসা করানোর ক্ষেত্রে বাবা-মার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। সামর্থ অনুসারে গ্রামীণ ডাক্তার দেখানো হয়েছে। তবে বড় কোন শহরে নিয়ে আধুনিক চিকিৎসা করানো হয়নি। অনেকটা অসচেতনতা এবং কিছুটা অর্থনৈতিক অভাবের কারণেই হয়নি। তবে ফকির এবং কবিরাজ দেখানো হয়েছে অনেক। কুসংস্কারের উর্দ্ধে এরা উঠতে পারেনি। সর্বোপরি আল মামুন একা নয় হুমায়ুন কবির নামে তার বড় ভাইও ঠিক তারই মত মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী। একই পরিবারে দুই ভাই প্রতিবন্ধী।

আল মামুনের বাবা ইশারত একজন কৃষক। নিজের যে জমি আছে তাই-ই চাষাবাদ করেন। মাসিক আয় প্রায় ১৬০০ টাকার মত। টিনের ঘর বেঁধেছেন। মোটামুটি গ্রামীণ স্বচ্ছল পরিবার বলা যায়। ইশারত শেখের ৩ ছেলে এবং ২ মেয়ে। বড় মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ২টি ছেলে প্রতিবন্ধী। এক ছেলে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন। যে মেয়েটি অবিবাহিত আছেন সে-ই দেখাশোনা করেন প্রতিবন্ধী ভাইদের।

কোন অনুষ্ঠান বা পার্বণে অন্য সদস্যের নতুন পোষাক না দিলেও মামুন এবং ওর ভাইকে দেয়া হয়। কারণ, তারা নতুন পোষাকের প্রতি দুর্বল। এমনকি পাড়া প্রতিবেশীরাও তাদের মাঝে মাঝে উপহার দেয়। মেজভাই, যে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন, সেও বাড়ি এলে কিছু-না-কিছু কিনে নিয়ে আসে প্রতিবন্ধী ভাইদের জন্য।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত-এর মাঝে যত কাজ তার বেশীরভাগই করে দিতে হয় মামুনকে। এক জায়গায় বসিয়ে দিলে খুব কষ্ট করে হামাগুড়ি দিয়ে সামান্য নড়াচড়া করতে পারে। গোছল করানো, কাপড় পড়ানো, খাবার দেওয়া সকল কাজই করে তার বোন রেবা। মামুন পরিষ্কারভাবে কথাও বলতে পারেনা, আর যেটুকু বলতে পারে তাও বোঝা খুব দুষ্কর। অথচ রেবার কোন বিরক্তি নেই। তাঁর মন্তব্য, 'আজ বাবা আছেন তিনি দেখছেন, যেদিন তিনি থাকবেন না তখন আমাদেরকেই দেখতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টি তিনিই রক্ষা করবেন'। বোঝা যায় ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

মামুন এবং তার ভাইকে কেউ কোথাও নিয়ে যান না। কারণ দুটি-প্রতিবন্ধী সন্তানকে বয়ে নিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। বিশেষ করে রিক্সা বা ভ্যানেও তারা বসতে পারে না। বর্তমানে শরীর কিছুটা ভারীও হয়েছে।

পরিবারের সকল সদস্য তাদেরকে খুব ভালবাসেন। কোন বিরক্তি বা বোঝা মনে করেন না। শুধু মনে করেন, ওরা যেহেতু কিছু করতে পারে না, সেহেতু ওদের কাজ অন্যদের করে দেওয়া উচিত। সেই দায়িত্ব পালনের মানসিকতা থেকেই ওরা মেনে নিয়েছে সবকিছু।

কোন অনুষ্ঠান বা পার্বণে অন্যদের নতুন পোষাক না দিলেও মামুন এবং ওর ভাইকে দেওয়া হয়। কারণ তারা নতুন পোষাকের প্রতি দুর্বল। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীরাও তাদের মাঝে মাঝে উপহার দেয়। মেজভাই, যে সেনাবাহিনীতে চাকুরি করেন, সেও বাড়ি এলে কিছু-না-কিছু কিনে নিয়ে আসে প্রতিবন্ধী ভাইদের জন্য।

একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রণালীর সঙ্গে মামুনের কোন মিল নেই। শুধুমাত্র চলন প্রতিবন্ধী হলেও সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে সুস্থ চিন্তা এবং কাজ করা সম্ভব। কিন্তু উভয় দিক থেকে প্রতিবন্ধী হলে তার স্বাভাবিক জীবনযাপন প্রণালী ব্যাহত হয় প্রায় সকল দিক থেকে। যেমন-মামুন এবং তার অন্য প্রতিবন্ধী ভাইকে রাতে ভাত খেতে দেওয়া হয় না। কারণ হলো, রসালো খাবার খাওয়ালে রাতে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হতে পারে। প্রস্রাব-পায়খানা যেটা করাতে খুব কষ্ট করতে হয়। সেই বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবার জন্য রসালো খাবার দেওয়া হয় না। বর্তমানে প্রতিবন্ধী ভাইয়েরা নিজেরাও কষ্টের বিষয়টি বুঝতে শিখেছে। তাই তারা নিজেরাও আর খেতে চায় না। তারা বেশির ভাগ সময় শুকনো খাবার যেমন-চিড়া, মুড়ি, রুটি ইত্যাদি খায়। যাতে রাতে ওঠার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।

লেখাপড়া করার প্রতি মামুনের খুব আগ্রহ। কিন্তু চলাফেরা করতে না পারার কারণে তাকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়নি। স্কুল কি জিনিস তা মামুন মোটেই জানে না। মাঝে মাঝে রেবা বই নিয়ে চেষ্টা করে পড়াতে। কিন্তু উচ্চারণ করতে তাদের এত কষ্ট হয় যে ভাইদের চেয়ে রেবাই কষ্ট পায় বেশী।

ইকবালের অদম্য ইচ্ছা

ইকবাল সর্দার। বাড়ি পশ্চিম সায়েড়া। বাবার নাম মতলেব সর্দার। ইকবাল একজন প্রতিবন্ধী। তার ডান পায়ে সমস্যা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। লোকে তাকে খোঁড়া বলে ডাকে। জন্মগতভাবেই সে প্রতিবন্ধী। ইকবালের বাবার ধারণা, বাও-বাতাস লেগে ছেলের এ অবস্থা হয়েছে। যখন ইকবাল মায়ের গর্ভে ছিল, তখন তার মা বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করত। অসাবধানে চলাফেরা থেকেই তার সন্তানের এ অবস্থা।

ইকবাল পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। স্কুলের ছেলেরাও তাকে খোঁড়া বলে। তাই মনের কষ্টে সে আর কখনো স্কুলে যায়নি। যদিও সে মনে করে একজন প্রতিবন্ধীর কিছু লেখাপড়া জানা থাকলে সমাজ সে তার স্থান করে নিতে পারে।

ইকবালের বর্তমান বয়স ১৫ বছর। ১৯৯৯ সালে ফকিরহাটের সমাজসেবা অধিদপ্তরে সে ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ নিয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রায় ১ বছরের। সেখানকার শিক্ষকগণ তাকে খুব ভালবাসত। সে যাতে হাতে-কলমে সঠিকভাবে কাজ শিখতে পারে সেই প্রচেষ্টা তারা করেছেন, প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতিতে ইকবাল আজ গ্রীল তৈরি করতে পারে।

ইকবাল প্রতিবেশীদের কাছ থেকে একটি নতুন নাম উপহার পেয়েছে তা হলো, 'খোঁড়া'। এ নাম সমাজ তাকে দিয়েছে। তাতে সে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। কারণ এ নামকরণের জন্য সে মোটেই দায়ী নয়। ভাবে, এজন্য জোর প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সে শক্তি কোথায়? ইকবাল ভাবে, তার মতো, অনেক প্রতিবন্ধী আছে সমাজে। কেউ কি এসে দাঁড়াবে তাদের পাশে? অন্তত: 'খোঁড়া' নামটি ঘুঁচিয়ে সেখানে 'মানুষ ইকবালকে' গ্রহণ করবে?

ইকবালের বাবা পানের ব্যবসা করেন। সংসারে ৫ ছেলে এবং ২ মেয়ে নিয়ে তিনি 'দিন আনে দিন খায়' অবস্থায় জীবনযাপণ করছেন। প্রতিবন্ধী ইকবাল তৃতীয় ছেলে। তার প্রতি আলাদা দৃষ্টিপাত করার সুযোগ তার হয়নি। লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তিনি কখনো তাকে উৎসাহিত করেননি। ভেবেছেন সেতো অক্ষম-প্রায়।

ইকবালের ইচ্ছা সে তার কারিগরি শিক্ষাকে কাজে লাগায়। কিন্তু অত মূলধন পাবে কোথায় যে একটি ওয়ার্কশপ দিতে পারে! অন্যের দোকানে কাজ করতে গেলে যথাযথ

মজুরি পায় না। কারণ অন্য মালিকদের ধারণা ইকবালের প্রতিবন্ধকতার কারণে দোকানে প্রয়োজনীয় শ্রম দিতে পারবে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের লাভ কমে যাবে। তাই তাকে মজুরিও কম দেওয়া হয়। ইকবাল জাল বুনতে পারে। গ্রামের লোকের জাল বুনে দিয়ে সে সামান্য কিছু টাকা আয় করে। সব মিলিয়ে সে ৩/৪ শত টাকা মাসে আয় করে। শ্রম ছাড়াও নিজের উপার্জিত টাকা থেকে সংসারে সাহায্য করে।

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম জনাব মোস্তাফিজুর রহমান তাকে একবার ৪ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। সেই টাকা তখন সে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেনি। এককথায় বলা যায়, খেয়েই শেষ করেছে। কিন্তু আজ মনে করে যে টাকাটা থাকলে কাজে লাগত।

পরিবারে ইকবালের অবস্থান খুবই ভাল। কারণ তার পরিবার মনে করে অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় ইকবাল বেশি সাহায্য করে। পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে তার মতামত নেয়া হয়। ইকবাল ভাবে, যদি আরো বেশী উপার্জন করতে পারত, তাহলে সে আরো ভাল ভূমিকা রাখতে পারত।

প্রতিবন্ধিত্ব নিয়ে ইকবাল মাঝে মাঝে ভাবে, কেন এমন হল! বাবা-মায়ের মুখে শুনেছে ছোটবেলায় নাকি অবস্থা আরো খারাপ ছিল। তখন তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী ডাক্তার দেছিয়েছে। ফলে শারিরীক অবস্থা বেশ কিছুটা উন্নত হয়েছে। তাইতো আজ সে খুঁড়িয়ে হলেও চলতে পারে। ইকবালের মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি মা-বাবা আরো ভাল ডাক্তার দেখাতো, তাহলে হয়তো সম্পূর্ণ ভাল হত। কিন্তু তার বাবার সেই সামর্থ তখন ছিল না।

ইকবাল প্রতিবেশীদের কাছ থেকে একটি নতুন নাম উপহার পেয়েছে তা হলো, 'খোঁড়া'। এ নাম সমাজ তাকে দিয়েছে। এতে সে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। কারণ এ নামকরণের জন্য সে মোটেই দায়ি নয়। ভাবে এজন্য জোর প্রতিবাদ করবে। কিন্তু সে শক্তি কোথায়? ইকবাল ভাবে তার মতো অনেক প্রতিবন্ধী আছে সমাজে। কেউ কি এসে দাঁড়াবে তাদের পাশে? অন্তত 'খোড়া' নামটি ঘুঁচিয়ে সেখানে 'মানুষ ইকবালকে' গ্রহণ করবে?

নাজিম শেখের ছিন্ন ভিন্ন সংসার

রণবিজয়পুর গ্রাম। এ গ্রামের একজন বাক প্রতিবন্ধীর নাম নাজিম শেখ। জন্মগতভাবে সে প্রতিবন্ধী। নাজিম বাবা-মার প্রথম সন্তান। যখন শিশুরা স্বাভাবিক নিয়মে কথা বলা শুরু করে, নাজিম তখনো চুপচাপ। বাবা-মা ভেবেছে অনেক বাচ্চারা দেরিতে কথা বলা শেখে। নাজিমও হয়তো সে রকম। কিন্তু আরো কিছুদিন পরে তারা উপলব্ধি করল যে তাদের সন্তান কথা বলতে পারে না। অনেক কবিরাজ ও ফকির দেখানো হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয় নি। মা এখন মনে করে তার কর্মের দোষেই সন্তান বোবা হয়েছে।

নাজিমের বাবা বশির শেখ মারা গেছেন ৫ বছর পূর্বে। বর্তমানে নাজিমের বয়স ২৬ বছর। তারা ৩ ভাইবোন। বড় শখ করে একটি বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একটি মেয়ে হওয়ার পর তার স্বামী মারা যায়। সেই মেয়েকে নিয়ে বিধবা বোন নাজিমের সংসারে বসবাস করে। আয় বলতে খানজাহান আলী দরগার মোড়ে নাজিমের একটি ছোট চা-রুটির দোকান আছে। বেচাকেনা যা হয় তাই দিয়েই কোন প্রকারে ৪ সদস্যের সংসার চলে যায়।

বোবাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ। সমাজ তাকে বোবা নামে আখ্যায়িত করেছে। রাস্তায় চলার সময় অধিকাংশ লোকে বলে, 'বোবা যায় বোবা যায়'। তার দোকান চেনাতে হলেও লোকে বলে বোবার দোকান। এখন তার নাজিম নামটাও ঢাকা পড়ে যাবার উপক্রম। অনেকে নাজিম বললে চেনে না, কিন্তু বোবা বললেই চেনে সকলে।

তিন বছর পূর্বে নাজিমের মা নাজিমকে বিয়ে করায় পাশের গ্রামে। নাজিম যে বোবা সে কথা কন্যাপক্ষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েই পুত্রবধূ ঘরে তোলেন তিনি। প্রথমদিকে ভালভাবেই স্বামী-স্ত্রীর সংসার চলছিল। অভাব-অনটন ছিল বটে, তবে বাক প্রতিবন্ধিতা নিয়ে কোন বিতর্ক ওঠেনি। কিছুদিন পরে নাজিমের একটি মেয়ে হয়। নাজিমের স্ত্রী তাঁর বাক প্রতিবন্ধী স্বামীর প্রতিবন্ধিতার অজুহাতে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। বোঝাবুঝির পালা যেন শেষ হয়ে গেল মাত্র আড়াই বছরের মাথায়। অনেকটা মোহনিদ্রা ভেঙ্গে সোচ্চার কণ্ঠে সে ঘোষণা করল যে, বোবা স্বামীর ঘর করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি বাবার বাড়িতে গিয়ে দশ হাজার টাকা দাবি করে তালাক চেয়ে পাঠায়। দৈনিক ৩০/৪০

টাকা আয়ের দোকান থেকে নিজেদের পেটই চলে না। তার উপর দশ হাজার টাকার দাবি! নাজিম বুঝে উঠতে পারে না কি করবে! কাউকে কিছু বুঝিয়ে বলার ক্ষমতাও তার নেই। একজন মানুষের মুখের ভাষাই কি সব! নাজিমও বারবার চেষ্টা করেছে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনার জন্য। অবশ্য মুখের ভাষা নেই বলে ইশারায় বোঝাতে চেষ্টা করেছে। ক্ষমাও চেয়েছে যদি কোন ভুল করে থাকে তার জন্য। কিন্তু তার স্ত্রী কোন প্রকারেই বুঝবার চেষ্টা করেনি। অবশেষে ছাড়াছাড়ি।

নাজিম কখনো স্কুলে যায়নি। বোবা বলে স্কুলে পাঠানোর কথা ভাবেনি বাবা-মা। বোবাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে সে বিষয়ে তারা অজ্ঞ। সমাজ তাকে বোবা নামে আখ্যায়িত করেছে। রাস্তা থেকে চলার সময় অধিকাংশ লোকে বলে, 'বোবা যায় বোবা যায়'। তার দোকান চেনাতে হলেও লোকে বলে বোবার দোকান। এখন তার নাজিম নামটাও ঢাকা পড়ে যাবার উপক্রম। অনেকে নাজিম বললে চেনে না, কিন্তু বোবা বললেই সকলে চেনে।

নতুন করে সে আর বিয়ে করতে রাজি হয় না। তার আড়াই বছরের মেয়ে, বিধবা বোন, বোনের একটি মেয়েকে নিয়ে কষ্ট করে হলেও নির্ঝঞ্ঝাট বেঁচে থাকতে চায়।

যদিও সে কোনদিন লেখাপড়া করেনি, তারপরও সে দেখেদেখে লিখতে পারে। হয়তো সে মোটেই বোঝে না কি লিখছে! লেখার আকৃতি দেখলে মনে হয় সে বুঝে-শুনেই লিখছে।

তাদের একটি মাত্র ঘর। সেই ঘরেই সংসারের ৪জন বসবাস করে। গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া ঘরখানিও ঠিকমত মেরামত করা হয় না আর আধপেটা খেয়েও সেই ঘরের ভেতর কাটিয়ে দিচ্ছে জীবন। অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাত্রার মত।

অনিশ্চয়তাই সুমিত্রার নিশ্চয়তা

সুমিত্রা রানী দাস। বয়স ২০/২২ বছর। বাড়ি বাগেরহাট উপজেলার ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের বারাকপুর গ্রামে। সুমিত্রা একজন প্রতিবন্ধী। তার প্রতিবন্ধকতা একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সুমিত্রার স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি হয়নি। বসা অবস্থায় তার উচ্চতা সর্বোচ্চ দেড় ফুট। হাঁটতে পারে না মোটেই। পা সোজা হয় না। ভাঁজ করে বসে থাকে। মা তাকে কোলে করে এখানে-ওখানে নেয়।

জন্মের সময় সুমিত্রা আকারে খুব ছোট ছিল। মা-বাবা ভেবেছিল কত শিশুইতো আকারে ছোট হয়ে জন্মায়। পরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৈহিক বৃদ্ধিও ঘটে। কিন্তু সুমিত্রার বেলায় তা হয়নি। বাবা-মার ধারণা, এটা সৃষ্টিকর্তার একটি খেলা। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। কবিরাজ, ওঝা, ফকিরগণ মনে করে সুমিত্রা যখন গর্ভে ছিল, তখন মায়ের উপর ভূত বা প্রেতের বদনজর পড়েছে। অন্যদিকে, ডাক্তার মনে করেন এমন রোগীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি না ঘটলেও অনেকে হাঁটতে পারে। কিন্তু সুমিত্রা যখন পারে না তখন এটা পোলিও রোগ ছাড়া অন্যকিছু নয়। যদিও সুমিত্রাকে আধুনিক কোন চিকিৎসককে দেখানো হয়নি।

সুমিত্রার বাবা অনাথ বন্ধু দাস একজন কৃষক। বসতবাড়ী ছাড়া ধানের জমি নেই বললেই চলে। অন্যের জমি চাষ করেন। তাতে বছরের কয়েক মাস খেতে পারে। বাকী সময় দিনমজুরী করে আয় করেন। মাসিক আয় গড়ে ৩ হাজার টাকার কাছাকাছি। বাড়িতে একটি টিনের ঘর, বেড়া কাঠের এবং পাশে একটি ছোট রান্নাঘর করেছেন। সুমিত্রার মা বাড়িতে হাঁসমুরগী পালন করেন। একটি গৃহস্থ পরিবার বলতে যা বোঝায় অনেকটা সে রকম।

সুমিত্রা গান শুনতে খুব ভালবাসে। বাবা তাকে একটি ছোট রেডিও কিনে দিয়েছেন। সারাদিন বসে বসে সে গান শোনে। ঘরে বসে সে খেজুরপাতার পাটি তৈরি করতে পারে। যেহেতু চলাফেরা করা তার জন্য অসম্ভব, সেহেতু পরিবারকে সে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারেনা। তবে মা তাকে কোলে করে চুলার পাশে বসিয়ে রান্নার সামগ্রী জোগাড় করে দিলে সে রান্না করতে পারে। মার ধারণা সুমিত্রার রান্নার হাত খুব ভাল। মাকে মাঝে মাঝে কাঁথা সেলাই করে দেয়।

সুমিত্রা ভাই-বোনদের মধ্যে বড়। তারা দুই বোন এবং এক ভাই। সুমিত্রার বোনটি ভারতে এক আত্মীয়র কাছে থাকে। বাড়িতে একমাত্র ভাই কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। সুমিত্রাকে লেখাপড়া করানো সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র চলন প্রতিবন্ধিতার কারণে। সুমিত্রা

যখন ছোট ছিল তখন তাকে কোলে করে মা এদিক সেদিক বেড়াতে নিয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে সে বড় হওয়ায় তা আর সম্ভব হয় না। সে কারণে সুমিত্রার মাও কোথাও বেড়াতে যায় না। গেলে মেয়েকে দেখবে কে? এমনকি পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে নতুন কোন বৌ আসলে সুমিত্রার মা দেখতে যায় না। কারণ সুমিত্রা শুনে মনে কষ্ট পাবে যে মা তাকে ছাড়া বৌ দেখতে গিয়েছেন। সুমিত্রাকে দেখাতে না পারার জন্য নিজেও দেখেন না। আর যদিও বা কখনও কোন আকর্ষণীয় বিষয় দেখেন তা বাড়িতে এসে বলেন না। মেয়ের জন্য নিজের অনেক আনন্দ উৎসব ত্যাগ করেন তিনি।

প্রতিবেশীরা সুমিত্রাকে ভালবাসে। তবে কোন কোন প্রতিবেশী সুমিত্রাকে দেখে খোঁড়া অথবা বামন বলে কটুক্তি করে। সুমিত্রার মা এসব কথা শুনেও না শোনার চেষ্টা করেন। কখনো তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন না, তবে কখনো কোন শিশু এমন কথা বললে, সে ক্ষেত্রে তিনি তাদের বুঝিয়ে বলেন, এ ধরনের কথা না বলার জন্য।

জন্মের সময় সুমিত্রা আকারে খুব ছোট ছিল। মা-বাবা ভেবেছিল, কত শিশুইতো আকারে ছোট হয়ে জন্মায়। পরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৈহিক বৃদ্ধিও ঘটে। কিন্তু সুমিত্রার বেলায় তা হয়নি। বাবা-মার ধারণা, এটা সৃষ্টিকর্তার একটি খেলা। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কিছু যায় আসে না। কবিরাজ, ওঝা, ফকিরগণ মনে করে সুমিত্রা যখন গর্ভে ছিল, তখন মায়ের উপর ভূত বা প্রেতের বদনজর পড়েছে। অন্যদিকে, ডাক্তার দেখালে তারা মনে করে স্বাভাবিক বৃদ্ধি না ঘটলেও অনেকে হাঁটতে পারে। কিন্তু সুমিত্রা যখন পারে না তখন এটা পোলিও রোগ ছাড়া অন্যকিছু নয়। যদিও সুমিত্রাকে আধুনিক কোন চিকিৎসককে দেখানো হয়নি।

পরিবারের লোক ছাড়া অন্য কোন লোক কোন প্রশ্ন করলে সুমিত্রা জবাব দেয় না বললেই চলে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে ক্ষিপ্ত হয়, দুর্ব্যবহার করে। কখনও কখনও গালাগালি পর্যন্ত করে। মা বলেন, 'ছোটবেলাতে ওর স্বাভাবিক মানসিকতা ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তার মেজাজ চড়া হয়ে গেছে।' একটি শিশু বড় হয় অন্য শিশু বা প্রতিবেশী সঙ্গী-সাথীদের সাহচর্যে। কিন্তু সুমিত্রার বেলায় ঘটেছে সম্পূর্ণ উল্টো। সে কোল থেকেই পরিবার ছাড়া আর কারো সাথে মিশতে পারেনি। সঙ্গীহীনতা তাকে একাকিত্বের রাজ্যে বন্দী করেছে। সেই বন্দীশালা থেকে সুমিত্রা চেষ্টা করলেও বের হতে পারে না। সামাজিক কোন প্রকার সুযোগ তার নাগালে পৌঁছায়নি। সেজন্য সুস্থ কোন লোককেই সে সহ্য করতে পারে না। সামান্য কথাতেই উত্তেজিত হয় বকাবকি করে। এমনকি তার মা যদি অন্য কারো কাছে তার সম্পর্কে বলে, তাহলে মাকেও সে বকাবকি করে। লেখাপড়ার প্রতিও ওর প্রচণ্ড ঘৃণা।

কলেজে পড়া ভাইটি যদি কখনো তাকে পড়াতে যায়, তার উপরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সব থেকে বেশি ক্ষিপ্ত হয় 'বিয়ে' 'মৃত্যু' এবং 'কেউ নিয়ে যাবে' এই তিনটি বিষয়ের কথা শুনলে। তখন সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মুখে যা আসে তাই বলে।

সুমিত্রার সকল আবদার, বায়না তার বাবার কাছে। কখনো যদি মা তার সাথে রাগ করেন, তাও সে বাবার কাছে অভিযোগ করে। বাবা তার অন্যান্য সন্তানদের চেয়ে সুমিত্রাকে একটু বেশিই ভালবাসেন। তাইতো পরিবারের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে সুমিত্রার মতামতের মূল্য দেন তিনি।

সুমিত্রার মা আমেনা ভাবেন, যদি বাড়ির কাছাকাছি স্কুল থাকতো তাহলে তিনি সুমিত্রাকে ছোটবেলা থেকেই কোলে করে স্কুলে দিতেন এবং তাতে সুমিত্রা লেখাপড়া শিখতে পারত। যদি চিকিৎসার কোন সুযোগ থাকতো তাহলে সবকিছুর বিনিময়ে তার চিকিৎসা করাতেন। সমাজ যদি মেনে নিত তাহলে তার বিয়ের প্রস্তাব আসত। কিন্তু কোনটাই বোধহয় সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই যতদিন তিনি জীবিত আছেন ততদিন ওর যত্ন করে যাবেন। আর যখন তিনি থাকবেন না, তখন সৃষ্টিকর্তাই তাকে দেখবে। তবে, মেয়ের ভবিষ্যত যে অনিশ্চিত তিনি তা বুঝতে পারেন। অর্থনেতিকভাবে একমাত্র ছেলে যদি কোন দিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তখন তাকেই বলবেন দিদির জন্য কিছু একটা করতে।

নিরাশ্রয়ী মিলন

আব্দুল হক গাজী (মিলন) একজন প্রতিবন্ধী। চলন প্রতিবন্ধী। দুই পায়েই সমস্যা। হাঁটতে গেলে খুব কষ্ট হয়। জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী। বর্তমানে তার বয়স ১৮ বছর। বাবার নাম ইমাম আলী গাজী। বাড়ি বাদোখালী গ্রামে। বাবা মারা যান মিলনের ছোটবেলায়।

ছেলেবেলা কিছুদিন মায়ের কাছে রাখার পর মা মিলনকে এতিমখানায় রেখে দেন। সেখানে মিলন পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়ার সুযোগ পায়। খুবই অবহেলিতভাবে সেখানে সে ছিল। ঠিকমত খাওয়া নয়, যত্ন নয়। মিলন মনে করে সে প্রতিবন্ধী বলেই অন্যান্য ছাত্রদের থেকে তাকে অবহেলার চোখে দেখা হত। পরবর্তীতে এতিমখানার প্রশাসনিক জটিলতা শুরু হলে সেখান থেকে সে চলে আসে। কোন প্রকার লক্ষ্য নেই তখন তার প্রতি কারো। ভাবে, হাতের কোন কাজ শিখতে পারলে ভাল হত। কারণ সুস্থদের মত সে কখনোই চলাফেরা করতে পারবে না। তাই অন্যদের মত সকল কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু হাত-ই তার ভরসা।

একটি বিজ্ঞপ্তি তার দৃষ্টি কেড়ে নিল একদিন। ফকিরহাট প্রতিবন্ধী সেন্টার প্রতিবন্ধীদের হাতের কাজ শিক্ষা দেবে। সেখানে ভর্তি হল। বেছে নিল দর্জি বিভাগ। খুব মনোযোগ দিয়েই শিখল দর্জির কাজ। যদি কখনো কাজে লাগাতে পারে! তাহলে হয়তো বেঁচে থাকার একটি উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে।

বাবা মারা যাবার সময় সামান্য কিছু জমি এবং একটি টিনের ঘর রেখে যান। মা হাতের কাজ অর্থাৎ ঝুড়িবোনা, সেলাই করা ইত্যাদি করে মাসে ৭০০/৮০০ টাকা আয় করত। তাই দিয়ে দুজনের আধপেটা খেয়ে দিন চলে যেত। হঠাৎ মা দ্বিতীয় বিয়ে করার পরিকল্পনা নেয়। মিলন প্রথমদিকে মোটেই মেনে নিতে পারেনি মার এ সিদ্ধান্ত। সে ভাবত, কোন একদিন সে নিশ্চয় আয়-রোজগার করতে পারবে। তা দিয়েই দুজনের চলে যাবে। একজন মানুষতো আর হাজার বছর বাঁচেনা! এ ক্ষুদ্র জীবনটুকু চালাতে হলে সামান্য আয় হলেই হবে। মাকে সে তার কথা খুলে বলতে পারেনি লজ্জায়। মা কি মনে করে বসে! অন্যদিকে মাও ছেলেকে ফেলে দিতে পারেন না। যদি সুস্থ হত, তাহলে ভিন্ন কথা। প্রতিবন্ধী সন্তানকে যদি তার নতুন স্বামী মেনে নিতে না পারে সেই আশঙ্কায় তিনি তার জমি থেকে ছেলের নামে বাড়ির ভিটে থেকে কিছু জমি লিখে দেয়। অনেকটা ছেলের ভবিষ্যত ভাবনা ভেবেই। কিন্তু তার সে ভাবনা বেশিদিন স্থায়ী হল না।

মায়ের নতুন স্বামীর সঙ্গে তার ধীরে ধীরে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। মিলনকে সে মোটেই সহ্য করতে পারে না। এর একমাত্র কারণ হতে পারে সামাজিক মূল্যবোধ। স্ত্রীর পূর্বের সংসারের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে দেখতে হলে যে মানসিকতার দরকার আমাদের সমাজে তা অধিকাংশ মানুষেরই নেই। তার উপর আবার প্রতিবন্ধী।

কিছুদিন পরে দেখা গেল মিলনের মাও তার নতুন স্বামীর সুরে সুর মেলাতে শুরু করলেন। এতদিন মিলনকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তার পরিবর্তন হয়ে নতুন স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে যোগ হল। যে মিলনের কোন ত্রুটি ছিল না কোনকালেই, সে মিলনের এখন অনেক ত্রুটি তিনি দেখতে পেতে লাগলেন। মিলন তার মার নতুন স্বামীকে একসময় মেনেই নিয়েছিল। মিলন ভেবেছিল, মা হয়তো একটি নির্ভরশীল আশ্রয় চায়। মায়ের আশ্রয় মিলল বটে, কিন্তু বিনিময়ে মিলনের আশ্রয়টি হারিয়ে গেল। সৎ পিতার দুর্ব্যবহার, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কটুক্তি ইত্যাদি মিলনকে দূরে ঠেলে দিল। কষ্টের ভেলায় চড়ে মিলন পৃথক হয়ে গেল মায়ের সংসার থেকে। তাতে মুক্তি পেল সৎ পিতা। হাসি ফুটলো মায়ের মুখেও। অপরদিকে, মিলন সঙ্গী-সাথী হারা নির্বাক একা এক ঘরে। নিজের ভাগ্যের, নাকি সমাজের পরিহাস, তা মিলন জানেনা। শুধু জানে, সে একা এবং একজন অসহায় প্রতিবন্ধী।

কিছুদিন পরে দেখা গেল মিলনের মাও তার নতুন স্বামীর সুরে সুর মেলাতে শুরু করলেন। এতদিন মিলনকে যে দৃষ্টিতে দেখতেন তার পরিবর্তন হয়ে নতুন স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি তার সাথে যোগ হল। যে মিলনের কোন ত্রুটি ছিল না কোনকালেই, সে মিলনের এখন অনেক ত্রুটি তিনি দেখতে লাগলেন। মিলন তার মার নতুন স্বামীকে একসময় মেনে নিয়েছিল। মিলন ভেবেছিল, মা হয়তো একটি নির্ভরশীল আশ্রয় চায়। মায়ের আশ্রয় মিলল বটে কিন্তু বিনিময়ে মিলন নিরাশ্রয়ী হয়ে গেল। সৎ পিতার দুর্ব্যবহার, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কটুক্তি ইত্যাদি মিলনকে দূরে ঠেলে দিল। কষ্টের ভেলায় চড়ে মিলন পৃথক হয়ে গেল মায়ের সংসার থেকে। তাতে মুক্তি পেল সৎ পিতা। হাসি ফুটলো মায়ের মুখেও। অপরদিকে মিলন সঙ্গী-সাথী হারা নির্বাক একা এক ঘরে। নিজের ভাগ্যের, নাকি সমাজের পরিহাস, তা মিলন জানে না। শুধু জানে, সে একা এবং একজন অসহায় প্রতিবন্ধী।

প্রায় তিনমাস হল মিলন একাকী জীবনযাপন করে। একাই আয় করার চেষ্টা করে। নিজে রান্না করে এবং নিজেই খায়। দেখা বা শোনার কেউ

নেই। মাকে ছেড়ে একা থাকতে তার খুব কষ্ট হয়। তার এ কষ্ট তার মাকে কখনো সে বলতো না। এর কারণ রাগ না অভিমান তা মিলন বলতে পারেনা। মাঝে মাঝে মনে হয় যদি কখনো রাতের অন্ধকারে অসুস্থতার জন্য কাতর হয়ে পড়ে অথবা মারা যায়, তাহলে মুখে এক ফোঁটা পানি দেয়ার মত তার কেউ থাকবে না।

নিজের আয়ের দ্বারা নিজের জীবন চালাতে হয় বলে লেখাপড়ায় সমস্যা হয় মিলনের। সে বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্কুলের শিক্ষকগণ তাকে খুব ভালবাসেন। বিশেষ করে হেডমাষ্টার সাহেব তাঁকে খুব উৎসাহিত করেন। তিনি চান মিলন লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াক। স্কুল কর্তৃপক্ষ মিলনের নিকট থেকে বেতন কম নেয়। স্কুলে তাঁর অন্তরঙ্গ চারজন বন্ধু আছে। সেই চার জনের মধ্যে একজনকে তার সকল সুখ-দুখের কথা বলে।

আয় বলতে মিলন কয়েকজন ছাত্র পড়ায়। গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা টিউশনী ফি সময়মত এবং পরিমাণমত পরিশোধ করতে পারে না। জনপ্রতি ১০০ টাকাও কেউ কেউ দিতে চায় না। অনেক সময় সম্পূর্ণ অনাদায়ী থেকে যায়। মিলন ভাল ছবি আঁকতে পারে। ছবি আঁকার ব্যাপারে তার কোন শিক্ষক নেই। নিজস্ব চিন্তাভাবনার আলোকে সে ছবি আঁকে। পেন্সিলের ব্যবহার বেশি করে। কারণ দামি রং কিনে ছবি আঁকার মত সামর্থ তাঁর নেই। ছবি এঁকেও সে কিছু আয় করে। গ্রামের লোকেরা তার ছবি আঁকার প্রশংসা করে বটে তবে, তাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিয়ে ঠিকমত টাকা দেয় না। তারপরও ছবির যৎ সামান্য আয় মিলনকে চলতে সাহায্য করে। অনেকে প্রশংসা করে মিলনকে বলে, 'তুমি আর্ট কলেজে পড় তাহলে ভাল হবে'। এই মন্তব্য শুনে মিলন আরো ব্যথা পায়। মনে মনে ভাবে, যদি আর্ট কলেজেই পড়ব তাহলে কেন প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নেব, কেন শিশুকালে আমার বাবা মারা যাবে! কেন মা আবার অন্যত্র বিয়ে করবে?' মাঝে মাঝে অলৌকিক চিন্তাও করে মিলন।

ছবি আঁকা নিয়ে মিলনের জীবনে ঘটেছে একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। যে ঘটনার জন্য মিলন নিজেকেই দায়ি করে। অথচ তার কিছুই করার ছিল না। শিল্পী নামের তার এক বান্ধবী ছিল। তার সঙ্গে প্রথম দিকে শুধুই বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই সে আশা করেনি। একদিন শিল্পী তার একটি ছবি এঁকে দিতে বলে মিলনকে। মিলন এযাবৎকালের মধ্যে যত ছবি এঁকেছে, বান্ধবী শিল্পীর ছবি সব থেকে হৃদয় নিংড়ানো মমতায় আঁকার চেষ্টা করে। ছবি দেখে শিল্পী হতবাক হয়ে যায়। তখন মিলনকে আর প্রতিবন্ধী মিলন মনে হয়নি এবং দুজনের হৃদয়ের সঙ্গে দুজনে একাকার হয়ে গেছে। এভাবেই আবেগের স্রোতে ভেসেছিল দুজনে। তখন মিলন ভাবত, 'আমি আর প্রতিবন্ধী নই'। আমাকে শিল্পীর মত সুস্থ মেয়ে যখন ভালবাসতে পারে তখন আমি সমাজের অন্যদের মত বাঁচতে পারব। কিন্তু প্রকৃতির কালবৈশাখী ঝড়ের মাতম যে

তার দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে দেবে তা মিলন জানত না। শিল্পী নিজেই এসে একদিন তাকে তার বিয়ের খবর দিয়ে ক্ষমা চেয়ে গেল। সে স্পষ্ট করে জানিয়ে গেল যে, চালচুলোহীন কোন প্রতিবন্ধীর সঙ্গে তার অভিভাবক তাকে বিয়ে দেবেন না। কারণ আবেগ দিয়ে তো আর জীবন চলে না। তুলি অথবা পেন্সিল চলতে পারে। সেইদিন মিলন সব থেকে বেশী বুঝতে পেরেছিল যে সে তো আসলে প্রতিবন্ধীই। সমাজ তাকে আলাদা করে দিয়েছে। মিলন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে, 'এর জন্য দায়ী কে?' কিন্তু কোন জবাব মেলে না।

বর্তমানে মিলনের জন্য মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু মিলন রাজী হয় না। তার আর ইচ্ছা করেনা বিয়ের ভাবনা ভাবতে। আর যদি ভাবতেই হয় তবে তা প্রতিষ্ঠিত হবার পর।

কখনো কখনো আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে মিলনের, যখন রাস্তায় চলাফেরার সময় তাকে লোকের কটুক্তি শুনতে হয়। ধনী বন্ধুদের সঙ্গে মিলন কখনো মেশেনি, আর তারাও মিলনকে বন্ধু হিসেবে নেয়নি। সমাজের স্বচ্ছল ব্যক্তিগণ দরিদ্র প্রতিবন্ধীদের এভাবে কোণঠাসা করে রাখতে অভ্যস্ত। এ পর্যন্ত বহুবার খোঁড়া সম্মোধন শুনতে হয়েছে মিলনকে। এমনকি কোন মেয়েকে প্রাইভেট পড়ালে তার মা এবং নানী পর্যন্ত সমালোচনা করে। তখন মিলন ভাবে, সে তো বিশ্বাস হারানোর মত এমন কিছু করেনি। তারপরও কেন এ কটুক্তি! এতকিছুর পরেও যখন মাঝে মাঝে হাত খরচের জন্য মায়ের কাছে হাত পাততে হয় তখন তার আত্মমর্যাদায় বড় আঘাত লাগে।

এখন মিলনের সামনে শুধু একটাই প্রত্যাশা-কবে নিজের মত করে একটু বাঁচবে! কবে লেখাপড়াটা নিশ্চিতভাবে করতে পারবে! অর্থনৈতিক সমস্যা আর থাকবে না। সর্বোপরি প্রতিবন্ধী নয়, একজন মানুষ হিসেবে সমাজে অন্যদের মত করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে মিলন।

আলোহীন আলামিন

অন্ধ আলামিনের বয়স ১০ বছর। গ্রাম পশ্চিম সায়াড়া। তার চার ভাইবোন। দুই ভাই-দুই বোন। বাবা নেই। ক্যান্সারে মারা গেছেন। তাকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সকল চেষ্টা। এখন মা-ই তাদের অভিভাবক। চারটি সন্তান নিয়ে তাদের মা এখন অথৈ পাথারে। এই চারটির মধ্যে তিনটি সন্তানই অন্ধ। অর্থাৎ প্রথম সন্তান, বড় মেয়ে এবং ছোট দুই ছেলে। পরিবারের পাঁচ জনের মধ্যে তিনজনই অন্ধ। বলা যায়, জন্ম থেকেই অন্ধ। মা বলেন, 'জন্মের সময় সুস্থ শিশুদের মত তাদের চোখও ভাল ছিল। যত বয়স বাড়ে ততো চোখ বসে যায় এবং তাদের দৃষ্টিহীনতা ধীরে ধীরে ধরা পড়ে ও স্পষ্ট হতে থাকে। মা-বাবা কেউই জানেনা কেন সন্তানদের এ অন্ধত্ব! পাড়া-প্রতিবেশীদের মন্তব্য, তাদের দুইজনের রক্ত পরীক্ষা করা দরকার ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি। তারা অসচেতন ছিল বলে প্রথম সন্তানের অন্ধত্বের পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র মেঝ মেয়ে সুস্থ।

মা সন্তানদের লালন-পালন করার জন্য অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। তিনটি সন্তান অন্ধ হওয়ায় তাদের যতটা যত্নের প্রয়োজন, তা তিনি করতে পারেন না।

আলামিন খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে। সে জানে, শুধু ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে বাকী জীবন তাকে কাটাতে হবে। জীবনের আঙিনায় আলোর ছটা কোনদিনই সে দেখেনি, আর দেখার সম্ভাবনাও নেই। সেটা ঢাকা থেকে আসা চক্ষু শিবিরের ডাক্তার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

পরিবারের সকল সদস্য মিলে একসাথে খেতে বসা হয় না বললেই চলে। মা কাজে যাবার সময় খাবার সামনে দিয়ে যায়। শুধুমাত্র হাত বুলিয়ে খেয়ে নেয় তারা। মাঝে মাঝে থালার খাবার মুরগী অথবা বেড়ালে ভাগাভাগি করে খেয়ে যায়। বুঝতে পারলে তাড়ায়, আর বুঝতে না পারলে তাড়াতে পারে না।

পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে মা পুরো সংসার চালান। আলামিনের একমাত্র ছোট চাচা তার সামর্থ্য অনুসারে দেখাশোনা করেন। তিনি এমনও ভাবেন, 'তার একটা চোখ কেটে আলামিনকে লাগিয়ে দিতে যদি কেউ পারে, তাহলে সে তার চোখ দিয়ে দেবে'।

মা ছাড়া একমাত্র সুস্থ রমিজা। সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে। রমিজা তার তিনটি অন্ধ

ভাইবোনকে নিয়ে কি করবে তা তার জানা নেই। যেহেতু মা পরের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করেন, সেহেতু অন্ধ ভাইবোনদের অনেকখানি দেখাশোনা তাকেই করতে হয়। অন্ধ বড় বোনের হাত ধরে মাঝে মাঝে বাড়ির আশেপাশে বেড়াতে বের হত। কিন্তু বর্তমানে বড় বোন বয়সে বড় হওয়ায় আর তাকে বাহিরে নিয়ে যাওয়া হয় না। এখন সে অন্ধ দৃষ্টির সাথে বন্ধ ঘরের অন্ধকারকে যুক্ত করে নিয়েছে।

আলামিনের পরিবারে তিন ভাই অন্ধ হওয়ায় কে কাকে দেখাশোনা করবে তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। বৃদ্ধা দাদী তার দুর্বল শরীর নিয়ে যতটুকু পারে ওকে সাহায্য করে। পরিবারের সকল সদস্য মিলে একসাথে খেতে বসা হয় না বললেই চলে। মা কাজে যাবার সময় খাবার সামনে দিয়ে যায়। শুধুমাত্র হাত বুলিয়ে অনুমানে খেয়ে নেয় তারা। মাঝে মাঝে থালার খাবার মুরগী অথবা বেড়ালে ভাগাভাগি করে খেয়ে যায়। বুঝতে পারলে তাড়ায়, আর বুঝতে না পারলে তাড়াতে পারে না।

ছোট অন্ধ ছেলেটি অনেক কিছুই বুঝতে চায় না। সামান্যতেই অনেক বায়না করে জেদ ধরে। সেই বায়না থামাতে তার চাচা পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এক সময় কেঁদে কেঁদে থেমে যায় তার বায়না।

মা কখনো বাইরে বেড়াতে যেতে পারে না। একসঙ্গে তিনটি অন্ধ সন্তান সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করা কতটা কঠিন কাজ, তা সেই বোঝে। আজকাল অন্ধদের জন্য শিক্ষার সুযোগ আছে কিনা তা আলামিনের মা সঠিক জানে না। তবে কেউ কেউ বলেছে, যশোর জেলা শহরে পাঠালে তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা থাকতে পারে। আলামিনের মা অন্ধ সন্তানদের দূরে পাঠাতে নারাজ। তার চিন্তা সেখানে কে তাদের দেখবে? হয়তো একদিন মরেই যাবে অনাদরে। তবে বাগেরহাটে যদি অন্ধদের জন্য কোন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান থাকতো, তাহলে আলামিনের মা অন্তত আলামিনকে সেখানে দিত। কাছাকাছি বলে মাঝে মাঝে গিয়ে তাকে দেখে আসতে পারতো।

আলামিনের মা ভাবে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এলাকাবাসী চাল, গম সাহায্য পায়। কিন্তু সে আজ পর্যন্ত কোন সাহায্য পায়নি। শুধু প্রতিবেশীরা ঈদ অথবা কোন উৎসবে সামান্য কিছু সাহায্য করে।

আলামিনের কাছে পৃথিবীর রূপ, পরিবেশ, লতাপাতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চুপ থাকে। একজন মানুষ অথবা কলমী ফুল কেমন তা সে জানে না। শুধু অনুভব করে। হয়তো সৃষ্টিকর্তা তার তৃতীয় চক্ষু হিসেবে সেটাকেই সচল রেখেছেন। সে রাজ্যে সে একাই বিচরণ করতে পারে, অন্য কেউ নয়।

জরিনার জবানবন্দী

জরিনা নামের অসহায় মেয়েটির জন্ম ষাটগম্বুজ ইউনিয়নের রণভূমি গ্রামে। বাবার নাম শেখ রহিমুদ্দিন। তিনি কৃষিকাজ করেন। নিজেদের সামান্য জমির উৎপাদনে সংসারের ভরণপোষণ সম্ভব নয় বিধায় পরের জমি বর্গা চাষ করেন। তিনবোন, একভাই ও মা-বাবা–মোট ছয়জনের সংসার, মোটেই স্বচ্ছল নয়। তার উপর দুইবোন প্রতিবন্ধী। জরিনা একটি পাথর চোখে পৃথিবীকে দেখে এবং ছোট বোন রহিমা বাক প্রতিবন্ধী। মাঝে মাঝে তার পরিবারটিকে প্রতিবন্ধীর পান্থশালা মনে হয়।

জরিনার যখন জন্ম হয়, তখন অদক্ষ গ্রাম্য ধাত্রী দ্বারা মায়ের প্রসব করানো হয়। সেই জন্মের সময় ধাত্রীর নখের খোঁচা লাগে বাম চোখে। তখন কেউই বিষয়টি লক্ষ্য করেনি। তিনমাস বয়সের সময় চোখটি লাল হতে শুরু করে। তারপর খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যন্ত্রণা শুরু হয়। দেখানো হয় খুলনা মেডিকেলের ডাক্তার। তখন তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। কিন্তু দিন দিন অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়। এক সময় চোখটি গলে গলে পড়তে থাকে। যখন বয়স এক বছর তখন চোখটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। খুলনা মেডিকেলেই চোখটি তুলে ফেলে দিয়ে একটি পাথরের চোখ লাগানো হয়। সেই থেকে এখন পর্যন্ত একটি পাথরের চোখ দিয়ে অন্য চোখটিকে সে সহায়তা করে যাচ্ছে। প্রকৃতির কোন রং, রূপ, আলো সেই পাথরকে ভেদ করে অন্তরে পৌঁছে না। অন্তরের কোমল বহি:প্রকাশও যেন মাঝে মাঝে সেই পাথরে বাধা পেয়ে অন্তরেই পুনরায় ফিরে আসে। ফলে বুঝতে শেখার পর থেকেই শুধু হৃদয়ের অপ্রকাশিত বোঝায় সে ভারাক্রান্ত।

হাজারো দরিদ্রতার মাঝে একটি চোখের সাহায্য নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় সে পার করেছে। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে। বাড়িতে হাঁসমুরগী পালনের সামান্য আয় ভাইবোনদের পেছনে ব্যয় হয়েছে। এত প্রচেষ্টার পরেও ভাবতে তার খারাপ লাগে যে একমাত্র ভাইকে মানুষ করতে পারেনি।

এখন তার মনে পড়ে স্কুলে যাবার সময় 'এক চোখা' অথবা 'কানা' ইত্যাদি বলে কটুক্তির তীর তাকে বিদ্ধ করেছে। রক্তাক্ত হৃদয় নিয়ে তবুও পথ চলেছে। জীবনে চলার পথ, বিশেষ করে একজন মেয়ে প্রতিবন্ধীর জন্য যে কতটা কন্টকময় তা সে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। ভাবে সে, সমাজ যদি সাহায্য করত তাহলে তার জন্য কিছু কিছু বিষয় অনেক সহজ হত। আর সহজ না হলেও অন্তত এতটা কঠিন হত না। পাড়া-প্রতিবেশীরা যখন তার বাবা-মার কাছে বলে, 'এক চোখ কানা

মেয়েকে টাকা-পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখানোর কি দরকার! তারচেয়ে একটা গরীব ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে দাও' তখন বাবা-মাসহ সে নিজেও কষ্ট পায়। ভাবে সে, মনুষ্য সমাজে বসবাস করি, নাকি আদিম যুগে? এত সমালোচনার পরেও সে ৬/৭ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে তারপর কলেজের গাড়ী ধরে ক্লাস করেছে। সামনে তার ডিগ্রী পরীক্ষা। স্বপ্ন দেখে, ডিগ্রী পাশ করে একটি স্কুলের শিক্ষিকা হবে। কারণ বাড়ীতে সে কিছু ছাত্রছাত্রী পড়ায়। গ্রামের দরিদ্র মানুষ খুব বেশী টাকা দিতে পারেনা। সামান্য যে টাকা পায় (৩০০ টাকা) তা দিয়ে নিজের চলতে তার খুব কষ্ট হয়। এতকিছুর পরেও প্রতিবেশীরা যখন তাকে 'কানাই মাষ্টার' বলে ডাকে, তখন সমাজের এই নিন্দুকের মুখে ছাই ফেলতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু তার সে শক্তি কোথায়?

কাউকে আজ পর্যন্ত বলা হয়নি যে এসএসসি পড়ার সময় তার একজন সহপাঠি তাকে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের অবস্থা বিবেচনা করে সে কখনও সাড়া দেয়নি। তাকে যাচাইও করতে চেয়েছিল যে, তার ভালবাসার গভীরতা কতটুকু! কিন্তু তার ফলাফল হিসেবে ফিরে এসেছে তার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কটুক্তি হয়ে। একচোখ কানা, তার উপর এত দেমাগ! তখন তার মনে হয়েছে প্রতিবন্ধিতা এমন এক দেয়াল যা ভেদ করে ভালবাসার আলোয় কখনো পৌঁছানো সম্ভব নয়। তারপর থেকে প্রেম-ভালবাসার খিরকীতে পাথরের গাঁথুনী দিয়ে রেখেছে। একবার অবশ্য সরাসরি বিয়ের একটি প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সে শক্ত ভাষায় না করে দিয়েছে। কারণ, তারা অনেক টাকা যৌতুক চেয়েছিল। বাবা-মাকে সে বুঝিয়ে রাজী করাতে সক্ষম হয়েছে যে, ছেলেকে যৌতুক না দিয়ে সে টাকা আমাকে দাও। আমি লেখাপড়া করব। বাবা-মা সেদিন তার কথা রেখেছিলেন বলেই আজ সে ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে, যৌতুকের টাকা দেয়ার জন্য তার বাবা শেষ জমি খন্ড বিক্রির হাত থেকে রেহাই পান।

মাঝে মাঝে তার নিজের জীবনের দিকে আর ফিরে তাকাতে ইচ্ছা করেনা। ছোট বোনের দিকে চেয়ে তার মনে হয় নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও যদি ছোট বোনটির মুখের ভাষা ফিরিয়ে দিতে পারত তাহলে জন্ম সার্থক মনে করতো। যদি দেশে বোবা লোকদের জন্য শিক্ষার সুযোগ থাকতো তাহলে কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে হলেও তাকে স্কুলে পাঠাতো। ওর জীবনটা সেক্ষেত্রে অন্যরকম হতে পারত।

অর্থ-বিত্ত কোনটাই তার কাছে কখনো কামনার বস্তু হয়নি। শুধু নিজের জীবনের বোঝা নিজে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য অর্জন করতে চায়। জরিনার মনোভাব তার পরিবার বুঝতে পারে। কারণ পারিবারিক কোন আলোচনায় তাকে অবহেলা করা হয় না। উপরন্তু ছোট ভাইবোনেরা তাকে বড় বোনের আসনে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করে। সেই মর্যাদার মূল্য রাখতে সে তার পরের বোনটিকে বিয়েতে রাজী করিয়ে বিয়ে দিয়েছে। সে চট্টগ্রামে স্বামী, সন্তান নিয়ে সুখেই আছে। ওদের সুখ কল্পনা করে সে নিজেও সুখ অনুভব করে।

টিন এবং গোলপাতার ছাউনী এবং খড়ের বেড়া দিয়ে জরিনার বাবা যে কুঁড়েঘর বেঁধেছে সেখানে প্রাচুর্য্যের ছোঁয়া নেই। শুধু আছে কোনভাবে বেঁচে থাকার আশা। সেই আশা নিয়েই পরিবারের সকলে সংগ্রামরত।

বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করার সময় ভালবাসা এবং বিয়ের প্রসঙ্গে কথা হয়। তাকেও তারা মাঝে মাঝে পীড়াপীড়ি করে কাউকে সে ভালবাসে কিনা তা জানতে। সে সব সময় তাদের বলে, 'আমাদের মত প্রতিবন্ধীদের ভালবাসতে নেই। কারণ, ভালবাসার বদলে করুণাই পাওয়া যায় বেশি।' কাউকে আজ পর্যন্ত বলা হয়নি যে এসএসসি পড়ার সময় তার একজন সহপাঠী তাকে প্রেম নিবেদন করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের অবস্থা বিবেচনা করে সে কখনও সাড়া দেয়নি। তাকে যাচাইও করতে চেয়েছিল যে, তার ভালবাসার গভীরতা কতটুকু! কিন্তু তার ফলাফল হিসেবে পেয়েছে তার প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে কটুক্তি। একচোখ কানা, তার উপর এত দেমাগ! তখন তার মনে হয়েছে প্রতিবন্ধিতা এমন এক দেয়াল যা ভেদ করে ভালবাসার আলোয় কখনো পৌঁছানো সম্ভব নয়। তারপর থেকে প্রেম-ভালবাসার খিরকীতে পাথরের গাঁথুনী দিয়ে রেখেছে। একবার অবশ্য সরাসরি বিয়ের একটি প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু সে শক্ত ভাষায় না করে দিয়েছে। কারণ, তারা অনেক টাকা যৌতুক চেয়েছিল। বাবা-মাকে সে বুঝিয়ে রাজী করাতে সক্ষম হয়েছে যে, ছেলেকে যৌতুক না দিয়ে সেই টাকা আমাকে দাও। আমি লেখাপড়া করব। বাবা-মা সেদিন তার কথা রেখেছিলেন বলেই আজ সে ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যদিকে, যৌতুকের টাকা দেয়ার জন্য তার বাবা শেষ জমি খন্ড বিক্রির হাত থেকে রেহাই পান।

এত প্রতিকূলতার মাঝেও হৃদয়ে অজানা এক আনন্দের সুরলহরী সে অনুভব করে যখন তার ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় ভাল ফল করে। ঠিক এমনি করে স্বাভাবিক শিশুদের মত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যও যদি লেখাপড়া করবার সুযোগ থাকতো, তাহলে তার অথবা তার বোনের মত প্রতিবন্ধীরা নিজের মত করে বাঁচার সুযোগ পেত। তারা আর কখনও নিজেদের অসহায় মনে করতো না।

আজ নিজের অবস্থান থেকেই তার বলতে ইচ্ছা করে, রাষ্ট্র যদি প্রতিবন্ধীদের মানুষ হিসেবে সমসুযোগ প্রদান করে, তাহলে প্রতিবন্ধীরাও অন্যদের মত নাগরিক ভূমিকা পালন করতে পারবে। যদি কখনো প্রতিবন্ধীরা একসঙ্গে সংগঠিত হয়ে তাঁদের মানবাধিকার সংরক্ষণ করার কাজে নেমে পড়ে তাহলে জরিনাও সেই মিছিলের একজন হবে বলে জানায়।

নিতীশের জীবনচিত্র

নিতীশ মহলী, পিতা: নিরোধ মহলী, গ্রাম: বারাকপুর, ইউনিয়ন: ষাটগম্বুজ, বাগেরহাট। নিতীশের বর্তমান বয়স ১৬ বছর। তাঁরা তিনভাই আর একটি পাতানো বোন। মা-বাবা সকলেই বেঁচে আছে। নিতীশ সকলের ছোট।

নিতীশ সাত মাস বয়স থেকে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবন্ধী হয়েছে। তার দুইপায়ে সমস্যা। সে স্বাভাবিক মানুষের মত হাঁটতে পারে না। গোড়ালীর উপর ভর করে হাঁটে। ডানহাতেও সামান্য সমস্যা আছে। তার মায়ের কাছে জানা যায়, ছোটবেলায় একবার সে দোলনা থেকে পড়ে গিয়েছিল। তারপর জ্বর হয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা করা হয়নি বললেই চলে। কারণ, সুযোগ ছিল না।

নিতীশের বাবা মূলত: একজন ভ্যানচালক। ভ্যান চালানোর পাশাপাশি শীতের সময় খেজুর গাছ কাটে। অনেক টানাপোড়েনের মাঝে তার সংসার চলে। নিতীশের বড় দুই ভাই কৃষিকাজ করেন। নিজের সামান্য কিছু জমি এবং অন্যের কাছ থেকে বর্গায় রাখা জমিতে কাজ করে। মাঝে মাঝে দিনমজুরীর কাজও করে। সংসারের বেশ কিছুটা চাহিদা তারা পূরণ করতে পারে।

মাত্র ৬/৭ কাঠা জমির উপর নিতীশদের বসত বাড়ী। টিন ও খড়ির দ্বারা তৈরি একটি ঘরে তাদের বসবাস। নারকেল, সুপারী, খেজুর গাছে ঘেরা ছায়া সুনিবিড় নিরিবিলি পরিবেশ।

সমাজের অন্যান্য শিশুদের মত নিতীশও লেখাপড়া শুরু করেছিল। স্কুলে যেতে তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। তবে বাড়ির কাছাকাছি স্কুল হওয়ায় যাতায়াতে কিছুটা সাহায্য হয়েছে। লেখাপড়া করার ব্যাপারে পরিবারের সকলেই তাকে সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ যুগিয়েছে। এমনকি নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মত অবস্থায়ও নিতীশের জন্য বাড়িতে গৃহশিক্ষক রাখা হয়েছে। লেখাপড়ায় নিতীশেরও আগ্রহ কম ছিল না। সে স্কুলের একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। প্রথম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত সে ছিল প্রথম। সেই নিতীশ এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। কেন এই অবস্থা?

লেখাপড়ার পাশাপাশি নিতীশ ভাল অভিনয় করত। তাদের স্কুলে প্রায় চার বছর সে প্রতিবন্ধী, পিতা এবং পাগলের অভিনয় করেছে। অভিনয়ে তার কোন প্রশিক্ষণ নেই।

তবে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী নিতীশ। তার পরিবার প্রথমদিকে তার এই অভিনয় করাকে সমর্থন করেনি। তবে বর্তমানে বাবা-মা সকলেই তার অভিনয় পছন্দ করে। অভিনয়ের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই সে ভাল গান গাইতে পারে। নিজে কবিতাও লিখতে পারে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সে পুরস্কারও পেয়েছে।

লেখাপড়ায় অবনতির কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন রাজীব নামের এক বন্ধুর সহযোগিতায় এক সহপাঠিনীর কাছে ভালোবাসার কথা জানাতে গিয়ে তারা দুজনেই লাঞ্ছিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত মেয়েটি তার রিক্সার চালককে দিয়ে নিতীশকে প্রচণ্ড মারধর করে। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে পরিবারে নিতীশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের সকলে তাকে সঠিক পথনির্দেশ না করে তার প্রতি উদাসীনতা দেখাতে শুরু করে। সেই থেকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাইরে আড্ডায় মেতে থাকে। সিগারেট খাওয়া শুরু করে। সেখান থেকে এক পর্যায়ে সে গাঁজায় আসক্ত হয়ে পড়ে। অনেক রাত নিতীশের জীবন থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে, যে রাতে সে বাড়িতেই ফেরেনি। উদ্ভ্রান্তের মত পথেঘাটে কাটিয়েছে। ভেবেছে, এমন কি অপরাধ সে করেছে যে তাকে অমানুষিক প্রহার করা হল! নিতীশ ভাবে, ভালবাসার কথা বলাটা কি পাপ, নাকি অপরাধ? পাপ হলে সমাজে এমন পাপ অনেকেই তো করে, তাদের তো এভাবে লাঞ্ছিত হতে হয় না। তাহলে কি আমার প্রতিবন্ধিতাই আমাকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা করেছে? এভাবে বেশ কিছুদিন কাটানোর পর ক্রমে ধাতস্থ হয় ফিরে আসে এরপর থেকে সে আর বাড়ির বাইরে যায় না। ভাবে, আবার পড়াশোনা শুরু করবে। কিন্তু ততদিনে

লেখাপড়ার অবনতির কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় সপ্তম শ্রেণীতে পড়াকালীন সময়ে রাজীব নামের এক বন্ধুর সহযোগিতায় এক সহপাঠিনীর কাছে ভালোবাসার কথা জানাতে গিয়ে তারা দুজনেই লাঞ্ছিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত মেয়েটি তার রিক্সার চালককে দিয়ে নিতীশকে প্রচন্ড মারধর করে। এই ঘটনার ফলশ্রুতিতে পরিবারে নিতীশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। পরিবারের সকলে তাকে সঠিক পথনির্দেশ না করে তার প্রতি উদাসীনতা দেখাতে শুরু করে। সেই থেকে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বাইরে আড্ডায় মেতে থাকে। সিগারেট খাওয়া শুরু করে। সেখান থেকে এক পর্যায়ে গাঁজায় আসক্ত হয়ে পড়ে। এমন অনেক রাত নিতীশের জীবন থেকে অতিবাহিত হয়ে গেছে, যে রাতে সে বাড়িতেই ফেরেনি। উদ্ভ্রান্তের মত পথেঘাটে কাটিয়েছে। ভেবেছে, এমন কি অপরাধ সে করেছে যে তাকে অমানুষিক প্রহার করা হল!

দেরি হয়ে গেছে অনেক। পড়াশোনার স্রোতমান জলধারায় পড়েছে চর। গতি আর আগের মত নেই। সে কারণেই নিতীশ নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। একান্ত নিভৃতে আন্তরিক পরিবেশে জানায়, এখন সে শুধু আত্মহত্যা করার একটি মাহেন্দ্রক্ষণ খুঁজছে।

সমাজে নিতীশকে অনেক কটুকথা শুনতে হয়েছে এবং হয়। স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রীরা 'ব্যাঙখোঁড়া' বলে উপহাস করে, এমন কি রাস্তায়ও। তখন সৃষ্টিকর্তার উপর তার খুব রাগ হয়। নিতীশের মনে হয়, সৃষ্টিকর্তার কি এমন স্বার্থ রক্ষা হল তাকে স্বাভাবিক মানুষের মত না করে প্রতিবন্ধীর কাতারে সামিল করে। এমন কি, যে মেয়েটিকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছিল, সেও নিতীশকে দেখে এমন উপহাসের হাসি হাসে; তাতে নিতীশ নিজেকে আর মানুষ বলে ভাবে না, অনেকটা জন্তুজানোয়ারের মতই মনে করে নিজেকে।

নিতীশের বাবা-মা সব সময় নিতীশের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করে। তাদের পরিবারের অন্যদের কেউ পড়াশোনা না করলেও তারা খেটে খেতে পারবে। কিন্তু নিতীশ তা পারবে না। তাই তাকে লেখাপড়া শেখানোয় তাদের খুব ইচ্ছে। যাতে করে নিতীশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

নিতীশের আক্ষেপ, প্রতিবন্ধী হিসেবে সামাজিকভাবে কোন সুযোগ পায়নি। এমনকি স্কুলে ভাল ফলাফল করার জন্যও নয়। তবে এলাকায় একজন ডাক্তার আছেন, যিনি নিতীশকে খুব ভালবাসেন। নিতীশকে অনেক মূল্যবান উপদেশ দেন। নিতীশ তাঁকে খুব পছন্দ করে।

নিতীশ ভাবে, যদি কখনো তাদের মত প্রতিবন্ধীদের জীবনের কথা ভেবে সমাজ সুযোগ করে দেয় তাহলে সে নিজের জীবনের কথা না ভেবে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে কাজে নেমে পড়বে। এখন তার শুধু একটা ইচ্ছা প্রবলভাবে তাকে অস্থির করে তোলে। সেটি হলো, 'সমাজ তাকে একজন মানুষ হিসাবে দেখুক, প্রতিবন্ধী হিসেবে নয়।'

আশাহত আসমা খাতুন

আসমা খাতুনের কথা বলছি। যে আসমা প্রতিবন্ধী, সেই আসমার কথা। বাড়ি তার পূর্ব সায়ড়া। সম্পূর্ণ অজ পাড়াগাঁ বলতে যা বোঝায়, সে রকমই একটা গ্রাম। আসমার জীবন কাহিনীতে মানবাধিকার লংঘনের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

আসমার বাবা শেখ জাবের আলী। কৃষিভিত্তিক পরিবার বলতে যা বোঝায় জাবের আলীর পরিবার ঠিক তাই। কৃষিকাজ করে সংসার চালান স্বচ্ছলতার সাথেই। স্ত্রী এবং ৪ ছেলে নিয়ে মোটামুটি সুখের সংসার ছিল। একদিন হঠাৎ করে জাবের আলীর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। জাবের আলীর সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়ল। তখন প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে ৩ ছেলে ৪ মেয়ের জন্ম হয়। সেই দ্বিতীয় স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান আসমা।

আসমার বয়স যখন ৩/৪ বছর তখন সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। অকেজো হয় তার বাম পা। কিন্তু আসমা এবং তার পরিবার মনে করে, আসমার 'বাও বাতাস' লেগেছে। বাবার কিছুটা সামর্থ থাকাসত্ত্বেও উন্নত চিকিৎসা করানো হয়নি তাকে। ওঝা-কবিরাজের শরণাপন্ন হয়েছিল। ফলে যা হবার তাই হলো। আসমার প্রতিবন্ধিতা স্থায়ী রূপ নিল। যে বয়সে বাচ্চারা হেঁটে-চলে বেড়ায়, আসমা তখনো হাঁটতে পারে না। তারপর আস্তে আস্তে সকলের চেষ্টায় একটু একটু করে হাঁটা শুরু করল। ঘরের বেড়া, ঘেরার বাঁশ ইত্যাদি ধরে শুরু হল তার চলাফেরা। এভাবে সে পা টেনে হাঁটতে পারে। এই অবস্থায় সে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। আসমার ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। কিন্তু সামাজিক অবস্থা তার কাছ থেকে সেই ইচ্ছাটা কেড়ে নিল। বাবার বয়সি কামাল শেখ নামের এক প্রতিবেশী তাকে রাস্তায় উত্যক্ত করতে শুরু করল। প্রথমে আসমা ভেবেছিল নিছক রসিকতা। রসিকতার ছলে সে তাকে রাস্তাঘাটে জড়িয়ে ধরত। অনেক সময় কামাল শেখ তার নিজের বাড়ীতে নিয়েও জড়িয়ে ধরত। কারণ, আসমাদের বাড়ির পাশেই কামাল শেখের বাড়ি। আসমা কামাল শেখের স্ত্রীর কাছেও এ বিষয়ে নালিশ করেছে। তখন তার স্ত্রী মন্তব্য করেছে, 'তোর সঙ্গে রস করে।' কিন্তু কামাল শেখের মনে ছিল অল্পবয়সী একটি প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করার লালসা। অবস্থা যখন চরম পর্যায়ে উঠল তখন আসমা আর রাস্তায় বেরোতে পারে না।

আসমার বাবা তখন মেয়েকে বাড়ির সামনে একটি দোকান করে দেয়। আসমা সেই দোকান নিজেই চালাতো, বেশ ভালভাবেই দিন কাটছিল তার। সম্পূর্ণ নিজে আয়-

রোজগার করতে পারে আসমা। নিজে উপার্জন করতে পারছে এটা ভাবতে তার খুব ভাল লাগে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল কামাল শেখ আসমার দোকানের পাশে একটি দোকান করল। সেইদিন থেকেই শুরু হল আসমার ভাগ্যের বিড়ম্বনা। কামাল শেখ দিনের পর দিন তাকে বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। তখন আসমার বয়স মাত্র ১৩ বছর। একটি কিশোরী বয়সের মেয়েকে কিভাবে বশ করতে হয় তা কামাল শেখ ভালভাবেই জানতো। কারণ যে আসমা নিজেই একদিন তার ঠাট্টা-মস্করা পছন্দ করত না, সেই আসমাই তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠল। অবস্থা বেগতিক দেখে কামাল শেখের স্ত্রী তার স্বামীকে আসমার সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু শর্ত হিসেবে স্বামীর নিকট থেকে বেশকিছু জমিজমা তার নিজের নামে লিখিয়ে নেয়। যখন আসমার বাবার কাছে কামাল শেখের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন আসমার বাবা-ভাইয়েরা এক কথায়ই রাজি হয়ে যায়। তাদের ধারণা, আসমার মত একটি প্রতিবন্ধী মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না। অতএব বিয়ে হয়ে গেল ১৩ বছর আসমার সঙ্গে প্রায় ৪০ বছর বয়সের কামাল শেখের। সে সময় কামাল শেখের প্রায় ২০ বছর বয়সের একটি ছেলে ছিল।

প্রতিটি প্রতিবন্ধীরই উচিত লেখাপড়া শিখে তার প্রতিবন্ধিতা ঘোঁচানো। এ সত্যটি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসমা। প্রতিবন্ধী বলে সামাজিক ভাবে তাকে বিভিন্ন অবস্থানে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এটিও তার একটি মানসিক যন্ত্রণা। যদি সে প্রতিবন্ধী না হতো, তাহলে স্বামীর এ অমানবিকতার বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াতো। কিন্তু তার সে মনোবল নেই, শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। তাইতো আসমা আজ ভাষা থাকতেও বোবা, চোখ থাকতেও অন্ধ এবং শ্রবণশক্তি থাকতেও বধিরের ভূমিকা পালন করছে। সব মিলিয়ে আজ আশাহত জীবন সংগ্রামে পরাস্ত আসমা।

বর্তমানে আসমার একটি ছেলে আছে। তার বয়স ৬ বছর। আসমার বয়স বর্তমানে ১৯ বছর। সতিনের সঙ্গে মোটেই ভাল সম্পর্ক নেই। সে কথাই বলে না তার সঙ্গে। আসমা থাকে আলাদা সংসারে । সুখ কি, তা আজ আর আসমা জানে না। সংসারে হাজারো অভাব-অভিযোগ, অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত জীবন বয়ে চলে আসমা। স্বামীর সংসার করতে তাঁর মোটেই ভাল লাগেনা। স্ত্রী হিসেবে সে মোটেই মর্যাদা পায়নি। ভালবেসে আজ আর সে কাছে টানে না। অথবা কোথাও বেড়াতেও নিয়ে যায় না। আসমা আজ ভাবে-বিয়ের আগে যেসকল কথা, যেসকল প্রতিশ্রুতি তার একটিও বাস্তবায়ন করেনি তার স্বামী।

শুধুমাত্র ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আসমা স্বামীর ঘরে আছে। তা না হলে সে আর থাকতো না। আসমার ধারণা, যাকে কখনো সে পছন্দ করতো না তাকেই সে কেন বিয়ে করতে গেল! তা হলে কি কামাল শেখ তাকে যাদু করেছিল! সেই ধারণা তার মধ্যে এখন প্রায় বদ্ধমূল। আসমা তার জীবনটাকে অর্থহীন করে দেবার জন্য শুধু স্বামীকেই দোষারোপ করে, অন্য কাউকে নয়।

স্বামী নামেমাত্র যে দায়িত্বটুকু পালন করে তা কোনভাবেই যথেষ্ট নয়। পাশেই বাবার বাড়ি বিধায় তারা সব সময় সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা করে। তা না হলে হয়তো শেওলার মত ভেসে যেতো সে।

প্রতিটি প্রতিবন্ধীরই উচিত-লেখাপড়া শিখে তার প্রতিবন্ধিতা ঘোঁচানো। এ সত্যটি আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আসমা। প্রতিবন্ধী বলে সামাজিকভাবে তাকে বিভিন্ন অবস্থানে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। এটিও তার একটি মানসিক যন্ত্রণা। যদি সে প্রতিবন্ধী না হতো, তাহলে স্বামীর এ অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াতো। কিন্তু তার সে মনোবল নেই, শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। তাইতো আসমা আজ ভাষা থাকতেও বোবা, চোখ থাকতেও অন্ধ এবং শ্রবণশক্তি থাকতেও বধিরের ভূমিকা পালন করছে। সব মিলিয়ে আজ আশাহত, জীবন সংগ্রামে পরাস্ত আসমা।

অপর্নার কথা

অপর্না কথা বলতে পারে না। তার বয়স ১৩ বছর। বাবার নাম জোতির্ময় দাস। বাড়ি পশ্চিম ডাঙ্গায়। একটি টিনের ঘরে তারা বসবাস করে। তিন বোনের, মধ্যে সে সবার বড়। বাবা কৃষিকাজ করেন। মায়ের মুখে সে জেনেছে বাবা নাকি এইচ, এস, সি পাশ। বাবা কিছুটা মানসিকভাবে অসুস্থ। মায়ের যখন বিয়ে হয় তখন তা মা জানতেন না যে বাবা কিছুটা মানসিক রোগী। বিয়ের পরে যখন জানলেন তখন তার আর কিছুই করার নেই। হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিলেন তার মা। এভাবে তিনবছর তিনি কাটালেন বাবার সঙ্গে। অনেক অত্যাচার, অনেক প্রহার তার শরীরে নীরবে হজম করেছেন। তারপর অপর্নার জন্ম। মায়ের উপর বাবার অত্যাচার আরো বেড়ে গেল। মা তখন ভয়ে এবং শিশুর নিরাপত্তার জন্য তার বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। একদিকে শিশুর চিন্তা, অন্যদিকে বাবার চিন্তা, এ দুইয়ে মিলে তার মা সর্বদা বিষণ্নতায় কাটাতেন। অপর্নার জন্মের পর সকলে ভেবেছিল সে সুস্থ। কিন্তু না, সে শোনে খুবই কম কিন্তু একেবারেই কথা বলতে পারে না। কিন্তু চারপাশের লোকেরা বুঝতে পারে যখন অপর্নার বয়স প্রায় এক বৎসর। তার মা যখন সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন তখন তিনি মানসিকভাবে আরো ভেঙ্গে পড়েন। একবার ডাক্তার দেখালেন, তার ধারণাকে যাচাই করার জন্য। ডাক্তারও একই মন্তব্য করলেন, তারপর মা তাকে বিভিন্ন ফকির-ওঝাদের কাছে নিয়েছেন। অনেকটা শেষ আশ্রয়ের মত।

অপর্নার মা এখন মনে করেন, মেয়ে যখন গর্ভে ছিল তখন বাবার মানসিক অসুস্থতা ও অত্যাচারের কারণে মাও মানসিকভাবে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকতেন। ফলে তার মেয়ের এ প্রতিবন্ধিত্ব। কখনো কখনো তিনি প্রচণ্ড রকম অপরাধবোধে ভোগেন। কারণ গর্ভাবস্থায় তিনি যদি স্বাভাবিক থাকতে পারতেন, তাহলে আর এমনটি হয়তো হতো না। আবার নিজের থেকেই সান্ত্বনা খুঁজে পান যে, পরিস্থিতি তার আয়ত্বে ছিল না।

যখন অপর্নার বয়স ১৮ মাস তখন মা তাকে নিয়ে তার বাবার কাছে চলে আসেন। সে সময় তার বাবার মানসিক অবস্থা সুস্থ। বাবা আগে বেশ মারধর করত মাকে। কিন্তু শিশু-সন্তান নিয়ে আসার পর আর মায়ের গায়ে হাত দেননি, শুধু বকাবকি করেন।

অপর্না লেখাপড়া জানে না। ছোটবেলায় অপর্নাকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে স্কুলে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে শিক্ষক কি বলেন সে শোনে না। অপরদিকে সে কি বলতে চায় শিক্ষক তা বোঝেন না। এ না শোনা এবং না বোঝার অসামঞ্জস্যতায় আর

স্কুলে যাওয়া হল না। তা সত্ত্বেও সে যে নাম লিখতে শিখেছে, এটা তার মা-ই তাকে ঘরে বসে শিখিয়েছেন। কিন্তু মা-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই সামান্য বিধায় আর অগ্রসর হতে পারেনি। এখনো সে মনে মনে ভাবে, যদি কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান তাকে মায়ের মত যত্ন করে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করত, তাহলে আজ মুখের ভাষা না থাকলেও কাগজ-কলমের ভাষাটা থাকত। সমাজে অন্যদের মত সেও হয়তো বেঁচে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেত। ছোট বোনেরা যখন স্কুলে যায়, তখন তাদের সাথে অপর্নারও যেতে ইচ্ছে করে। কখনো কখনো ওদের সঙ্গী হবার চেষ্টা করে, কিন্তু বিফল সে যাত্রা। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি এমন হতো যে, বোবারাও সহজে লেখাপড়া করতে পারবে, তাহলে কতই না ভাল হতো! সে শুনেছে ঢাকা, খুলনার মত বড় শহরে বোবাদের স্কুল আছে। কিন্তু সেখানে ওদের মত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা কিভাবে যাবে! আর গেলেও সুযোগ মিলবে কিনা কে জানে!

যদি কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান তাকে মায়ের মত যত্ন করে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করত, তাহলে আজ মুখের ভাষা না থাকলেও কাগজ-কলমের ভাষাটা থাকত। সমাজে অন্যদের মত সেও হয়তো বেঁচে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেত। ছোট বোনেরা যখন স্কুলে যায়, তখন তাদের সাথে অপর্নারও যেতে ইচ্ছে করে। কখনো কখনো ওদের সঙ্গী হবার চেষ্টা করে কিন্তু বিফল সে যাত্রা। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি এমন হতো যে, বোবারাও সহজে লেখাপড়া করতে পারবে তাহলে কতই না ভাল হতো! সে শুনেছে ঢাকা, খুলনার মত বড় শহরে বোবাদের স্কুল আছে। কিন্তু সেখানে ওদের মত দরিদ্র পরিবারের লোকেরা কিভাবে যাবে! আর গেলেও সুযোগ মিলবে কিনা কে জানে!

অপর্নার বোন দুটো। ছোট হলে কি হবে ওরা ওকে খুবই ভালবাসে। ওর ঠাকুর দাদার (মায়ের বাবা) বাড়ীর সবাই খুব ভালবাসে। এর একটা কারণ অবশ্য সে মনে মনে আন্দাজ করে নিয়েছে। তাহলো, সে বড় নাতনী এবং তাদের ভাষায় বাক প্রতিবন্ধী। সেজন্য সাধ্যমত তারা ভাল পোষাক দেয়। আদর করে 'ফুল' বলে ডাকে।

অপর্নাকে তারা মাঝে মাঝে বিয়ের কথা বলে আকার ইঙ্গিতে। বিয়ে বিষয়টা সে খানিকটা বোঝে। তবে মা মাঝে মাঝে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তখন সে তাকে ইশারায় নিষেধ করে। তবে বেশীরভাগ সময় সে চুপ থাকার চেষ্টা করে। ভাবে, মা তাকে জন্ম দিয়েছেন। তিনি বোঝেন তাকে, আর মায়ের মত

কে বুঝবে?

সংসারের অনেক কিছুই সে বোঝে। কারণ, সব সময় সংসারের কাজেকর্মে মা তাকে সঙ্গে রাখেন। সংসারের সকল আলাপ-আলোচনায় সে অংশগ্রহণ করে। তার মতামতের মূল্যও ওর বাবা-মা দিয়ে থাকেন। অবশ্য সে যদি তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় তাহলে। ওর কয়েকটি হাঁসমুরগী আছে। সেগুলিকে দেখাশোনা করে সে তার অবসর কাটিয়ে দেয়। মুরগির ডিমের হিসাবও রাখতে পারে। মাঝে মাঝে সেলাই করে। আর তার মাকে সাহায্য করা তো রয়েছেই। সংসারের কাজে মা যখন বেলা পার করে দেয় তখন ওর খুব রাগ হয়। বার বার পীড়াপীড়ি করে তাকে খেয়ে নেয়ার জন্য। সে অসুস্থ হয়ে পড়লে পুরো সংসারই যে অচল হয়ে যাবে! ওর মা ভাল একটা শাড়ী কিনতে চায় না। ওর হাঁসমুরগীর ডিম বিক্রির টাকা থেকে তাকে কিনতে অনুরোধ করে। কিন্তু সে তার কথা রাখতে চায় না। সে শুধু তিন মেয়ের কথা ভাবে।

মাঝে মাঝে অপর্না এ বাড়ি ও বাড়ি বেড়াতে যায়। কিন্তু আবার যেতে ইচ্ছেও করেনা, যখন অন্য ছেলেমেয়েরা তাকে বোবা বলে উত্যক্ত করে। এতে সে যতটা না ব্যথা পায়, ওর মা তার চাইতে বেশী ব্যথা পান। তিনি ওকে সবসময় খারাপ মন্তব্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য আগলে রাখেন।

এতকিছুর পরেও অপর্না যখন কাজে ব্যস্ত থাকে তখন গোপনে সে লক্ষ্য করে মা আমার দিকে বিমর্ষভাবে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হয়তো ভাবেন, এই বোবা মেয়েকে নিয়ে তিনি কি করবেন?

মাহবুবার-মাহবুব

মাহবুবা সাধারণ আর পাঁচটি শিশুর মতই সমাজের কাছে নাগরিক অধিকারের দাবি ঘোষণা করে পৃথিবীতে আসে। আজ ২৩ বছরের ব্যবধানে মাহবুবা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? মাহবুবা তার জীবনের ফেলে আসা এতগুলো বছরের দিকে যখন তাকায়, তখন অনেকটা দু:স্বপ্নের মত মনে হয়।

বাগেরহাট থানার ষাটগম্বুজ ইউনিয়ন। গ্রামের নাম রণবিজয়পুর। একটি ছায়া-সুনিবিড় বাড়িতে কতগুলো শিশু খেলার ছলে ছুটোছুটি করছিল। বিপত্তি ঘটেছিল একদিন। এক বছরের মাহবুবা খেলতে গিয়ে পড়ে যায়। এমনি খেলতে গিয়ে পড়ে যায় তো সব শিশুই। সেই পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচন্ড জ্বরে প্রায় এক মাস ভুগেছে মাহবুবা। জ্বর থেকে ভাল হবার পরই খেসারত হিসেবে জীবন তার কাছ থেকে এমন সম্পদ ছিনিয়ে নিল যা ২৩ বছরের জীবন আর ফিরিয়ে দেয়নি। দেবার কোন সম্ভাবনাও নেই। অর্থাৎ বাম পায়ের স্বাভাবিক চলনশক্তি রহিত হয়ে গেছে।

মাহবুবার বাবা একজন গোঁড়া ধার্মিক ব্যক্তি। তবে প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার পরিবর্তে অন্ধত্ব স্থান পেয়েছে তার মধ্যে। বেশ কিছু ভক্তবৃন্দের সাহায্য-সহযোগিতায় তার সংসার চলত। নিজের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় এবং সচেতনার অভাবে মেয়েকে কোন প্রকার চিকিৎসা করানো হয়নি। আজ মাহবুবা বুঝতে পারে সে পোলিও রোগের শিকার। একেতো শিশু বয়স, তার উপর পোলিও রোগের আক্রমনে একটি পা ক্ষতিগ্রস্ত। এমতাবস্থায় মাহবুবার দরকার নিশ্চিত ভরসার স্থান। একসময় সেটুকুও থাকলো না। আড়াই বছর বয়সে বাবার বদরাগী স্বভাব এবং শারীরিক নির্যাতনের জন্য মা সংসার জীবন ছিন্ন করলেন। সঙ্গে নিলেন মাহবুবাকে। প্রথম পিতৃস্নেহারা হল মাহবুবা। তিনমাস পর আবার বাবা তাকে তার কাছে নিয়ে আসলেন। এবার স্থায়ীভাবে মাতৃস্নেহ হারাবার পালা। অন্যদিকে ঘরে এল সৎ মা। সৎ মায়ের দুর্ব্যবহার, বাবার উদাসীনতা সত্ত্বেও শিশু মাহবুবা বুঝতে পারেনি যে, প্রতিবন্ধী নামক বন্দীশালায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার মানবিক অধিকারের অধিকাংশ দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

কারো কোন উৎসাহ ছাড়াই মাহবুবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাতায়াত শুরু করে। শিশুসুলভ মনোভাবের কারণে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বান্ধবীদের প্ররোচনায় একদিন বইয়ের সকল মলাট ছিঁড়ে ফেলে। ধর্মান্ধ অসচেতন বাবা ভাবলেন মেয়ের লেখাপড়ায় মনোযোগ নেই। ফলশ্রুতিতে, লেখাপড়ার ইতি ঘটে। আজ এত বছর

পরে মাহবুবা মনে করে প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও সে যদি লেখাপড়াটা চালিয়ে যেতে পারত, তাহলে তার জীবন আজ অন্যরকম হতে পারত।

বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া টাকায় স্বামী যখন জুয়া খেলে তখন কোন স্ত্রীই সুস্থ থাকতে পারে না। মাহবুবাও পারেনি। যখন নীরব প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছে, তখন ক্রীতদাসীদের মত ব্যবহার ও উচ্ছিষ্ট জুটেছে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী হিসেবে সমাজে সুস্থদের মত নিজের কোন স্থান নেই বিধায় স্থবির হয়েছিল। সে জানতো না যে যৌতুক-বিরোধী আইন তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে অথবা নির্যাতানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এমনকি তার বাবাও কখনও তার সাহায্যে এগোয়নি। মাহবুবার ধারণা, একটি প্রতিবন্ধী মেয়ের জন্য তার বাবার পরিবার কেনই বা এতটা ঝামেলা পোহাবে! ঠিক এমনই দুঃসময়ের মাঝে গর্ভে নতুন জীবনের উপস্থিতি উপলব্ধি করে মাহবুবা। জীবনের ভাবনার গতি পরিবর্তিত হয়।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মাহবুবা বুঝতে পারে সে আর সমাজের অন্যদের মত নয়। বাইরে চলতে গেলে কটুক্তি, কোথাও বেড়াতে গেলে অযত্ন, কোন কথা বলতে গেলে হেলাফেলা। এতকিছুর ভেতর থেকে নিজেকে লুকিয়ে রেখে শুধুমাত্র অলস সময় কাটানোর জন্য হাতের সেলাই শিখেছে। এভাবে ৮ বছর কেটে গেল অচেতনভাবে। সৎ মায়ের ঘরে আরো তিনটি ভাইবোন এলো। বড়বোন হিসেবে অন্য ভাইবোনেরা কখনো অবহেলা করেনি। তারপরও নিজের মনের কাছে অপরাধবোধ জন্ম নেয় যখন মনে হয় বড় বোন হিসেবে তার যা দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করতে পারেনি।

ইতিমধ্যে ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যায়। সামাজিকভাবে মাহবুবার বাবা-মা সমালোচনার সম্মুখীন হন। একেতো শারীরিক প্রতিবন্ধী, তার উপর ছোট মেয়ের বিয়ে! সামাজিক সমালোচনা থেকে বাবাকে মুক্তি দেবার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক নিকট আত্মীয়র (ফুফাতো ভাই) সঙ্গে বিয়েতে রাজি হতে হয় মাহবুবাকে। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। সেই ব্যাধির হাত থেকে প্রতিবন্ধী মাহবুবাও রক্ষা পায়নি বিয়েতে। ৮৪ হাজার টাকা যৌতুক দেবার প্রতিশ্রুতিতে মাহবুবার বিয়ে হয় বেকার ফুফাতো ভাইয়ের সাথে। ভেবেছিল, যৌতুকের বিনিময়ে হলেও স্বামীর ঘরে কোনভাবে জীবন কাটিয়ে দেবে। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি তার বাবা। মাত্র ১৫ হাজার টাকা দিতে দেরি হওয়ার কারণে স্বামী, শ্বাশুড়ী সহ পরিবারের সকলে মিলে তাকে নির্যাতন শুরু করে। এই নির্যাতনের মাত্রা বর্ণনা করার ভাষা মাহবুবার জানা নেই। বাবার বাড়ি থেকে যৌতুক

হিসেবে দেওয়া টাকায় স্বামী যখন জুয়া খেলে তখন কোন স্ত্রীই সুস্থ থাকতে পারে না। মাহবুবাও পারে নি। যখন নীরব প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছে, তখন ক্রীতদাসীদের মত ব্যবহার ও উচ্ছিষ্ট জুটেছে। শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী হিসেবে সমাজে সুস্থদের মত নিজের কোন স্থান নেই বিধায় স্থবির হয়েছিল। সে জানতো না যে যৌতুক-বিরোধী আইন তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে পারে অথবা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। এমনকি তার বাবা কখনও তার সাহায্যে এগোয়নি। মাহবুবার ধারণা, একটি প্রতিবন্ধী মেয়ের জন্য তার বাবার পরিবার কেনই বা এতটা ঝামেলা পোহাবে! ঠিক এমনই দুঃসময়ের মাঝে গর্ভে নতুন জীবনের উপস্থিতি উপলব্ধী করে মাহবুবা। তাতে তার জীবনের ভাবনার গতি পরিবর্তিত হয়।

সন্তান গর্ভে নিয়ে স্বামী ও শ্বাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মাহবুবা এক সময় বাবার বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হয়। সেখানেই তার একটি পুত্র সন্তান হয়। হাজারো দৈন্যতার মাঝে মাহবুবা বেঁচে থাকার এক টুকরো আলো খুঁজে পায়। সেটি হল তার পুত্র সন্তান, তার মাহবুব।

এই পুত্র সন্তান জন্মের এক বছর পর স্বামী তার ভুল বুঝতে পারে। সে মাহবুবার কাছে আসে পুনরায় স্বামীর দাবিদার হয়ে। তখনো সে বেকার। স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণ দেয়ার মত সামর্থ তার এখনও নেই। তবে উপলব্ধিটুকু জন্ম নিয়েছে যে, তার কিছু একটা করা দরকার। তাই বর্তমানে মংলা বন্দরে অস্থায়ী ভিত্তিতে সে যেটুকু আয় করে তার থেকে স্ত্রী ও সন্তানকে নামমাত্র আর্থিক সহায়তা করে।

ছেলের ভবিষ্যত চিন্তা করে প্রায় ১২ বছর পর মাহবুবা কারিগরি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। তখন তার ছেলের বয়স ৪ বছর। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব প্রায় ৩ কিলোমিটার। স্বামী যে টাকা দেয় তাতে তার রিক্সাভাড়াই ঠিকমত হয় না। তার উপর ছেলের আবদার, 'আম্মা আমার জন্য চকলেট-বিস্কিট কিনে আনো।' ছেলের আবদার মেটাতে মাহবুবা অসুস্থ পা নিয়ে হেঁটে যাতায়াত করে। যাতায়াতের পয়সা বাঁচিয়ে ছেলের জন্য খাবার কেনে। যেদিন সে হেঁটে যাতায়াত করে, সেদিন তার সমস্ত শরীরে প্রচন্ড ব্যথা থাকে। কোন কাজই করতে পারে না। তারপরও একটু সান্ত্বনা 'শিশু সন্তানের মুখের হাসি।'

জীবনের ২৩টি বছর বিকলাঙ্গতার যন্ত্রণা, বাবা-মায়ের স্নেহ বঞ্চিত, সৎমায়ের অত্যাচার, যৌতুকের শিকার, শারীরিক নির্যাতন, সামাজিক কটুক্তি সবকিছুকে অবলীলায় মেনে নিয়েছে শুধুমাত্র সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের আশায়। অত্যাচারী বেকার স্বামীকে পুনরায় কাছে টেনে নিয়েছে কেবলমাত্র সন্তানের সুস্থ জীবনের জন্য। এতকিছুর পরেও মাহবুবা যখন জানতে পারে তার মত প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি

প্রতিষ্ঠানসমূহে কোন সুযোগ নেই, তখন হতাশার কালো মেঘ তার চোখ দুটোকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তারপরও বেঁচে থাকার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবারো জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় মাহবুবা শুধু তার ভবিষ্যত সন্তান মাহবুবের জন্য।

মিনতির সাধ

মিনতি দাসের বাড়ি রণজিৎপুর। পিতা মৃত হরসিত দাস। মিনতির বর্তমান বয়স ২১ বছর। তিন বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে বিকলাঙ্গতার শিকার হয় সে। বাবার মৃত্যু হওয়ায় বড় ভাই সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব পালন করেন। স্বাভাবিকভাবেই বিকলাঙ্গ বোনের সকল দায়ভার বর্তায় তার উপর। তাতে তার কোন আক্ষেপ বা বিরক্তি নেই।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন। মা, বড় ভাই, ভাবী, বড় ভাইয়ের একটি ছোট মেয়ে এবং মিনতি নিজে। পরিবারটিকে এক কথায় শিক্ষিত বলা চলে। বড় ভাই এবং ভাবী বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে পড়তেন। তার মায়ের বয়স ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে হলেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে এখনো বেশ সচেতন।

মিনতির বাড়ি আর পাঁচটি সাধারণ গ্রাম বাংলার মতই একটি গ্রামে। অনেকটা কাঁচা রাস্তা ভেঙ্গে তার বাড়িতে যেতে হয়। বর্ষাকালে যাতায়াতের জন্য দুর্ভোগের অন্ত নেই। হেঁটে যাওয়া মোটেই সম্ভব হয় না মিনতির জন্য। টিনের চালা এবং কাঠের বেড়ার মাঝারী আকারের ঘর। চারপাশে সুপারী, নারিকেল, বাঁশ এবং বিভিন্ন প্রকার ফলের গাছের ছায়ায় বাড়ির সিংহভাগ রৌদ্রমুক্ত। আশপাশে অন্যান্য প্রতিবেশীদের নিয়ে মিনতিদের সামাজিক বসবাস।

প্রথম যখন তার অসুখ হয় তখন খুব জ্বর হয়েছিল সেই ছেলেবেলায়। কোমর এবং বাম পা প্রায় সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে গ্রামের বিভিন্ন প্রকার ভুল চিকিৎসা করানো হয়েছিল। অনিল ডাক্তার সনাতনী ধারণার উপর তাকে ভুল ইনজেকশন দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে মিনতিকে খুলনা হাসপাতালে ভর্তি করলে ভুল চিকিৎসা ধরা পড়ে।

সেখানে কিছুদিন চিকিৎসাধীন থেকে এবং ফিজিওথেরাপী করানোর ফলে বর্তমানে কোমরের সমস্যা বেশ কিছুটা দূর হয়েছে বটে, তবে বাম পায়ের সমস্যা রয়েই গেছে। হাঁটতে গেলে খুব কষ্ট হয়। হাঁটুতে একহাত রেখে ভর দিয়ে চলতে হয়। তাও খুব ধীরে।

বর্তমানে কোন চিকিৎসা করানো হচ্ছে না। তবে যদি কেউ উন্নত চিকিৎসার সুযোগ করে দেয় তাহলে আর একবার চেষ্টা করে দেখার মনোবাসনা রয়েছে তার। অবশ্য সেই আশা খুবই ক্ষীণ।

মিনতি নিয়মিত স্কুলে যাতায়াত করছে। বাড়ির কাছাকাছি স্কুল হওয়ায় সে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছে। তা না হলে শরীরের এত বড় প্রতিকুল অবস্থা নিয়ে দূরে কোথাও যাওয়া তার পক্ষে খুব একটা সহজসাধ্য নয়। স্কুল খুব কাছে হওয়া হত্ত্বেও সেখানে যেতে পথে তাকে কয়েকবার রাস্তার পাশে বসে বিশ্রাম নিতে হত। পরিবারের এমন সামর্থ নেই যে নিয়মিত রিক্সা অথবা ভ্যানে করে স্কুলে যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাকে শিক্ষা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এভাবেই সে এসএসসি পাশ করেছে। কলেজে নিয়মিত যাওয়া সম্ভব নয় বিধায় এইচএসসি প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু অকৃতকার্য হয় এবং তাতে খুবই কষ্ট পায় মিনতি। যদি সে সুস্থ থাকতো তাহলে ঠিকমত ক্লাশ করতে পারত, নোট জোগাড় করতে পারত। এতে তাকে অকৃতকার্য হতে হত না।

প্রতিবেশীদের যারা মিনতিকে চেনে বা জানে তাদের কাছ থেকে উদার সহযোগিতা পেয়েছে। আর সহযোগিতা না পেলেও কোন প্রতিকুলতার সৃষ্টি তারা করেনি। কখনো কটুক্তির সম্মুখীন সে হয়নি।

মানুষ হিসেবে প্রতিবন্ধীদেরকে কেন আলাদা শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে এটা মিনতি জানে না। একজন মানুষের যে অধিকার আছে, প্রতিবন্ধীদের তার কোনটিই নেই। স্কুলে, কলেজে, যাতায়াতে, চিকিৎসায় কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীদের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না বলে মিনতির আক্ষেপ রয়েছে। আর চাকরির কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

ডিসেম্বর '৯৯ সালে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় সে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ। এ পরীক্ষায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের একটি কোটা ছিল। মিনতি সঠিকভাবে জানে না কতভাগ কোটা ছিল। মিনতি জানে না সে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রতিবন্ধী সদনপত্র জমা দিতে হয়। সে এটাও জানে না যে কোথা থেকে প্রতিবন্ধী সনদপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

পরিবারের আয়ক্ষম ব্যক্তি একমাত্র বড় ভাই। তিনি পরিবারের জমাজমি দেখাশোনা করেন। সংসারের সকল দিক সামাল দিতে হয় একমাত্র ভাইকে। কিছু ধান, নারকেল, সুপারী এবং কিছু ফল বিক্রির আয়ে তাদের সংসার চলে। স্বাভাবিক অর্থে স্বচ্ছলভাবে চলা বলতে যা

বোঝায়, তা মোটেই নয়। কোন প্রকার টানাপোড়েনের মধ্যে চলমান এক সংসার বলা যায়। মা, স্ত্রী, কন্যাসহ একার উপার্জনে একটি সংসার কতখানি ভাল চলতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর মধ্যেও একজন প্রতিবন্ধী বোনের প্রতি ভাইয়ের যে মমত্ববোধ থাকা উচিত তা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে।

অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মিনতি সুযোগ করে নেয় ছাত্রছাত্রী পড়াতে। ছোট বাচ্চাদের পড়ায় সে। গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের এবং পরিচিত পরিবেশ বিধায় প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে সে খুবই কম টাকা পায়। তা দিয়ে নিজের লেখাপড়ার খরচও ঠিকমত হয় না। সংসারে দেবার মত সেটা আয়ও নয়। তবুও সে আশা ছাড়েনি। আয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পরিবারে মিনতির অবস্থান খুবই ভাল। তাকে নিয়ে কোন ঝামেলা হয় না। বরং সকলের সহায়তা, উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েই সে এতদূর লেখাপড়া করেছে। যে কাজ সে করতে পারে না, তাকে সে কাজ কখনো করতে দেওয়াও হয় না। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে মিনতির মতামত নেয়া হয়। শুধুমাত্র ভাইয়ের আয়ের উপর নির্ভরশীল বলে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়।

বিয়ের ব্যাপারে পরিবার থেকে মিনতির উপর কোন চাপ প্রয়োগ করা হয় না। পরিবার মনে করে, যদি কোন ভাল ছেলে মিনতিকে দেখে-শুনে-বুঝে নেয় তাহলেই তার কাছে বিয়ে দেবে। তবে মিনতি নিজে কখনো বিয়ের কথা ভাবে না। প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়ে তারপর বিয়ে। অবশ্য আজ পর্যন্ত কোন বিয়ের প্রস্তাবও আসেনি।

প্রতিবেশীদের যারা মিনতিকে চেনে বা জানে তাদের কাছ থেকে উদার সহযোগিতা পেয়েছে। আর সহযোগিতা না পেলেও তারা কোন প্রতিকূলতার সৃষ্টি তারা করেনি। কখনো কটুক্তির সম্মুখীন সে হয়নি। তবে কখনো কখনো অপরিচিত দু'একজন ওকে দেখে মুখ টিপে হাসে। তবে তা অন্য কেউ না বুঝলেও মিনতি ঠিকই বোঝে। সমাজের সুস্থ মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া সেই বিকৃত অনুভূতি।

ভবিষ্যত জীবনের বাস্তবতা মোকাবেলা করবার জন্য একমাত্র লেখাপড়া করে স্বাবলম্বী হওয়া উচিত এ কথাটি মিনতি ভালভাবে উপলব্ধি করে। স্বাবলম্বী হবার জন্য, বেঁচে থাকার জন্য সম্মানজনক যে কোন একটি পেশা গ্রহণে আপত্তি নেই মিনতির। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতাই তার সব থেকে পছন্দ। সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কাছে মিনতির একমাত্র চাওয়া একজন সুস্থ মানুষ যেভাবে বাঁচে সেভাবে না হোক সে যেন অন্যের গলগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের মত করে বাঁচতে পারে।

নিজেকে একজন সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে মিনতি সাধ্যমত চেষ্টা করে যাচ্ছে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সে তার সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করে। এলাকার

টিকাদান কর্মসূচিতে সে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। বাচ্চাদের টিকা দেবার জন্য সে সবাইকে উৎসাহ দেয়। যাতে তার মত পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়ে আর কোন শিশু বিকলাঙ্গ না হয়ে যায়। এ কাজের জন্য মিনতি একটি প্রশংসাপত্রও পেয়েছে। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করবার প্রতিশ্রুতি রয়েছে মিনতির।

মানসিকভাবে মাঝে মাঝে মিনতি হতাশায় ভোগে। সৃষ্টিকর্তার কাছে জানতে ইচ্ছে করে কোন দোষে তার এ অবস্থা! যে বয়সে সে বিকলাঙ্গ হয়েছে সেই বয়সে তার কোন দোষ বা অপরাধ হবার কথা নয়। আর যদি রোগের প্রশ্ন আসে সেও তো স্রষ্টা দেওয়া। সেই রোগের শোক কেন মানুষকে এত দুর্বল করে দেয়! মিনতি খুব সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে, তখন পরিবেশের শান্ত ভাব তাকে দূরপ্রান্তে নিয়ে যায়। আর সন্ধ্যাবেলায় যখন গোধূলি নামে, দাওয়ায় বসে মিনতির সে দৃশ্যও দেখতে খুব ভাল লাগে। দিনের এ দুটো সময় একান্তভাবেই শুধু তার।

মিনতির দাদা পঙ্কজ দাস বর্তমানে ডাক্তারদের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে। মিনতিও দাদার সাথে একমত। তারা মনে করে, ডাক্তার শুধুমাত্র সমাজের টাকাওয়ালা শ্রেণীর মানুষের জন্য। একই হাসপাতালে ডাক্তারদের দুই রকম ব্যবহারের একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। মানুষ হিসেবে প্রতিবন্ধীদেরকে কেন আলাদা শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে এটা মিনতি জানে না। একজন মানুষের যে অধিকার আছে, প্রতিবন্ধীদের তার কোনটিই নেই। স্কুলে, কলেজে, যাতায়াতে, চিকিৎসায় কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীদের কোন সুযোগ দেওয়া হয় না বলে মিনতির আক্ষেপ রয়েছে। আর চাকরির কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

দেশে বিভিন্ন প্রকার সংগঠন আছে। বিভিন্ন শ্রেণী নিয়ে কাজ করার জন্য। কিন্তু প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতার জন্য কোন সংগঠন আছে কিনা তা মিনতির জানা নেই। যদি এমন কোন সংগঠন সে পায়, যেখানে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা যাবে, তাহলে মিনতি সেখানে কাজ করবে বলে প্রতিজ্ঞ। এমনকি পরিবারও তাকে বাধা দেবে না বলে তার বিশ্বাস।

বড় আশা, বড় সাধ নেই মিনতির। অল্পতে যেমন খুশি হয়, তেমনি দুঃখও পায়। মনে পড়ে কোন এক নববর্ষের কাকডাকা ভোরে তার ঘরের দরজায় টোকা শুনে দ্রুত উঠে দরজা খুলে দেয়। দেখে তারই এক শ্রেণী বন্ধু হাতে একগোছা ফুল নিয়ে দাঁড়ানো। মিনতির দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলল, 'শুভ নববর্ষ'। এ অতি সামান্য একটি ঘটনা। তবুও মিনতির কাছে সুখময় অনুভূতির স্রোত বয়ে দেয়। এইটুকু সুখের মূল্য মিনতির কাছে অনেক।

কাজী ইমরানের ইচ্ছা শক্তি

রণবিজয়পুরের কাজী ইমরান। একনামে গ্রামের সবাই তাকে চেনে। ইমরানকে চেনার পেছনে দুটো কারণ রয়েছে। প্রথমত: সে একজন প্রতিবন্ধী, একটি পায়ে সমস্যা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। দ্বিতীয়ত: সে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, সমাজহিতৈষী, বন্ধুবৎসল এবং আড্ডাবাজ।

ইমরানের বাবা নৌবাহিনীতে চাকরি করতেন। খুব একরোখা স্বভাবের লোক তিনি। মারা গেছেন ২/৩ বছর পূর্বে। এমরান যখন ছোট তখন তার জ্বর হয় এবং একটি পা অচল হয়ে যায়। তার পরিবার শিক্ষিত ও সচেতন হওয়ায় তারা বুঝতে পারলেন, এটা কোন জ্বীনপরী অথবা বাও বাতাস বা ন্যাংড়া বাতাসের ব্যাপার নয়। এটা নিশ্চয় কোন রোগ। ইমরানের বাবা নৌবাহিনীর একজন ডাক্তারকে দেখাবার জন্য দিন-তারিখ ঠিক করলেন। কিন্ত তিনি নিজেই ইমরানকে নিয়ে সঠিক সময়ে পৌছাতে পারলেন না বলে ডাক্তারের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। তিনি তারপর আর ছেলেকে ডাক্তার দেখাননি বললেই চলে। প্রায়ই তিনি বলতেন, 'আমার অনেক আছে, একটি সন্তানকে বসিয়ে রেখে খাওয়াতে পারব।'

যেহেতু ইমরানদের পরিবার একটি শিক্ষিত এবং সচেতন পরিবার, সেহেতু পরিবারের ভেতরই লেখাপড়ার অনুশীলন রয়েছে। শিশু সুলভ আকর্ষণেই সে বাড়িতে পড়াশোনা শুরু করে। প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গে সে নিয়মিত প্রাথমিক স্কুলে যাতায়াত করে। বাড়ির পাশেই স্কুল। সামান্য পথ হাঁটতে হয়। তার কষ্ট হলেও সে এক অদম্য আকর্ষণে প্রাথমিক স্কুল শেষ করল। ভর্তি হল বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরের এক সরকারি স্কুলে। কিশোর বয়সের সবরকম উচ্ছ্বলতাই সে প্রকাশ করেছে। প্রতিবন্ধিতা তাকে কখনো দমিয়ে রাখতে পারেনি। একটি সুস্থ স্বাভাবিক তরুণের যে বৈশিষ্ট্য থাকে তারও রয়েছে সেগুলো। ইমরানের মাঝে এগুলোর কোনটিরই কমতি ছিল না। তারুণ্যের আলোকচ্ছটা তার প্রতিবন্ধিতাকে ম্লান করে দিয়েছে।

আজ ইমরান মনে করে তার মতো আরো অনেক শিশু ছিল বা আছে যারা তাদের ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না বলে প্রতিবন্ধিত্বকে অতিক্রম করতে পারে না। অতিক্রম করার জন্য প্রধানত দুটি বিষয় থাকা দরকার। একটি হলো অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, অন্যটি সচেতনতা। যা ইমরানের পরিবারের ছিল।

ইমরানরা আট ভাইবোন। তার বাবার দুই বিয়ে। প্রথম মা অর্থাৎ ইমরানের মায়ের পাঁচ সন্তান এবং ছোট মায়ের তিন সন্তান। ইমরান চতুর্থ সন্তান। বড় ভাইয়েরা ব্যবসার কারণে ঢাকায় বসবাস করেন বিধায় এইচ, এস, সি পাশ করবার পর স্নাতক পড়ার জন্য সে ঢাকায় যায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদল্যায় কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করে। শিক্ষাজীবনে একজন তরুণ ছাত্রের যে অনমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ইমরানের মধ্যে তার কোনটিরই কমতি ছিল না। এমনকি মাঠে খেলাধূলায়ও তার অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত সচরাচর ছিল। জয়-পরাজয় তার কাছে মুখ্য বিষয় ছিল না।

সামাজিকভাবে একজন যুবকের সচেতন মানসিকতা যে রকম হওয়া উচিত ইমরান অনেকটাই তার কাছাকাছি। ছোটবেলা থেকেই সে অন্যায়ের প্রাতবাদকারী। কিন্তু তারপরও ইমরান মনে করে, চোখের সামনে সমাজের অনেকেই অহরহ অন্যায় করে যাচ্ছে। যার একটু প্রতিবাদ জানালেই হয়তো প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু ইমরান তার ইচ্ছা অনুসারে প্রতিবাদ জানাতে পারে না। সে মনে করে, যদি কেউ তার প্রতিবাদের কারণে মারধর করে সেক্ষেত্রে মার খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তাই দেখেশুনে ইমরান চুপ থাকে। তবে বন্ধুদের সমর্থন থাকলে ইমরান উচিত কথা বলতে কাউকেই ছাড়ে না। সে যত বড় লোকই হোক না কেন!

সমাজ অথবা রাষ্ট্র যতটা প্রতিবন্ধীদের কথা না ভাবে একজন প্রতিবন্ধী অন্য একজন প্রতিবন্ধীর কথা তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবে। এটা ইমরান খুব ভাল বোঝে। সে নিজেই তার সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার প্রতিবন্ধিতাকে সহায়তা করে। সে রকম একটি ঘটনা ইমরানের প্রায়ই মনে পড়ে। একদিন দরগার মোড়ে কোন এক প্রতিবন্ধীকে রোজার সময় ভিক্ষা করা থেকে বিরত রেখে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ইফতার করিয়ে রিক্সাভাড়া করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়! এটি সে তার নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে করেছে। সমাজ সচেতন প্রত্যেক নাগরিকের এমন বোধ থাকা উচিত বলে সে মনে করে।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা ইমরানের রয়েছে। ঘুরে ঘুরে সে দেখেছে যে, দরিদ্র শ্রেণীর পরিবারেই প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বেশী হয়। এর একটাই কারণ, তা হল শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব।

প্রতিবন্ধীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে ইমরান আবেগপ্রবণ হয়ে বলল, 'একটি অন্ধ মেয়েকে কেন একটি সুস্থ ছেলে বিয়ে করবে না! এটা আমি ভেবে পাই না। একজনের চোখের আলো দিয়ে পৃথিবীতে অন্য আর একজন চলতে পারে। একথা আমাদের বোঝা উচিত।' ইমরান যখন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ডিগ্রী ক্লাসে পড়ে, তখন অনেক ভাল ভাল সুন্দরী মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছে। অনেক আবেগঘন মুহূর্তে

তাদের সঙ্গে কাটানোর সময় এবং সুযোগ ইমরানের হয়েছে। মনে হয়েছে, কোন কোন মেয়ের হৃদয়ের খুব কাছাকাছিও পৌছেছে সে। ভেবেছে, প্রেম নিবেদন করলে তারা হয়তো ফিরিয়ে দেবে না। তারপরও ইমরান কখনো প্রেমের কথা বলতে পারেনি। বারবার শুধু একটা কথাই ভেবেছে। একটি পায়ে সমস্যার জন্য যদি প্রত্যখ্যাত হয় প্রস্তাব, তাহলে দুঃখ পাবে নিজে। অবশ্য এত আন্তরিকতা, এত আড্ডা, এত গোধূলী লগ্নের মুদুমন্দ বাতাসে ঘুরে বেড়ানো! তারপরও কোন মেয়েই বলেনি ইমরানকে 'ভালবাসি'। ইমরান আজ মনে করে, সে যদি প্রস্তাব দিত তাহলে বিড়ম্বনা ছাড়া আরা কোন লাভ হতো না।

প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জীবনযাপন করা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে তাকে শুনতে হয় নানা ধরনের কটুক্তি। একদিন সে তালগাছে উঠেছিল। তালগাছ থেকে রস সংগ্রহের জন্য বাঁশের মই তালগাছের সঙ্গে বেঁধে গাছ কাটার ব্যবস্থা করা হয়। অনেকটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ইমরান গাছে উঠেছিল। কারণ, সুস্থ লোকেরা হরহামেশা উঠছে। অতএব তারও সেই যোগ্যতা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখবে। অনেক ঝুঁকি নিয়ে সে যখন তালগাছের মাথায় উঠল, তখন গাছের নিচে তার চাচার বয়সী একলোক মন্ত ব্য করেছিল 'খোঁড়া আবার তালগাছের মাথায় উঠেছিস নাকি?'। এই মন্তব্য করার জন্য ইমরান আজও তাকে মনে মনে ক্ষমা করতে পারেনি। প্রচন্ড ক্ষোভ রয়েছে এজন্য তার মনে। শুধুমাত্র সুদিনের প্রত্যাশায় রয়েছে, কঠিন ভাষায় এর সে জবাব দেবে একদিন।

সুস্থ লোকেরা একটি দেশের উন্নয়ন ধারায় যেমন সামিল হতে পারে তেমনি প্রতিবন্ধীদের সুযোগ দিলে তারাও আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের উন্নয়ন ধারায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত শাসক তৈমুর লং, বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিংস এবং বিশ্ব প্রতিবন্ধীদের অলিম্পিকে আমাদের প্রতিবন্ধীদের সাফল্যের কথা সে তুলে ধরে। প্রতিবন্ধীদের সুযোগের বিষয়ে ইমরান মনে করে, তাদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তারা যে অসহায় নয়, প্রতিটি পরিবারে সে বিষয়ে উৎসাহ ও সচেতনতা জাগাতে হবে। বিশেষ করে ভিক্ষাবৃত্তির মূলে আঘাত হানতে হবে। সম্ভব হলে সরকারি পর্যায় থেকে শুরু করে ধনী ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রতিবন্ধীদেরকে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করতে পারলে তারা এবং তাদের পরিবার ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

একজন প্রতিবন্ধী তার পারিবারিক জীবনে কখনো স্বাভাবিক মানসিকতা নিয়ে জীবন কাটাতে পারে বলে অনেকে ভাবতেই পারে না। এজন্য কোন কোন সময় স্ত্রী, পঙ্গু স্বামীকে যথার্থ মূল্যায়ন করে না। বরং উঠতে বসতে তার অসহায়ত্বকে খোঁটা দিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি করে। 'খোঁড়ার ঘর করতে এসে কোনকালে সুখ পেলাম না!' এই মন্ত

সমাজ অথবা রাষ্ট্র যতটা প্রতিবন্ধীদের কথা না ভাবে, একজন প্রতিবন্ধী অন্য একজন প্রতিবন্ধীর কথা তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবে। এটি ইমরান খুব ভাল বোঝে। সে নিজেই তার সামর্থ অনুসারে বিভিন্ন প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করে। সে রকম একটি ঘটনা ইমরানের প্রায়ই মনে পড়ে। একদিন দরগার মোড়ে কোন এক প্রতিবন্ধীকে রোজার সময় ভিক্ষা করা থেকে বিরত রেখে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ইফতার করিয়ে রিক্সাভাড়া করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়! এটি তার নৈতিক দায়িত্ব বলে সে মনে করে। সমাজ সচেতন নাগরিকের এমনটি ভাবা উচিত বলে মনে করে।

সুস্থ লোকেরা একটি দেশের উন্নয়ন ধারায় যেমন সামিল হতে পারে তেমনি প্রতিবন্ধীদের সুযোগ দিলে তারাও আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের উন্নয়ন ধারায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিখ্যাত শাসক তৈমুর লং, বিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিংস এবং বিশ্ব প্রতিবন্ধীদের অলিম্পিকে আমাদের প্রতিবন্ধীদের সাফল্যের কথা সে তুলে ধরে। প্রতিবন্ধীদের সুযোগের বিষয়ে ইমরান মনে করে, তাদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তারা যে অসহায় নয়, প্রতিটি পরিবারে সে বিষয়ে উৎসাহ ও সচেতনতা জাগাতে হবে। বিশেষ করে ভিক্ষাবৃত্তির মূলে আঘাত হানতে হবে। সম্ভব হলে সরকারি পর্যায় থেকে শুরু করে ধনী ব্যক্তিদের সহায়তায় প্রতিবন্ধীদেরকে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রভৃতি কাজে নিয়োগ করতে পারলে তারা এবং তাদের পরিবার ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

ইমরানের একটি ইচ্ছা, যদি সে যথাযথ সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তা পায় তাহলে বাগেরহাটের সকল প্রতিবন্ধীকে একত্রিত করে একটি মহাসমাবেশ করবে। সেই সমাবেশে প্রতিবন্ধীদের বাস্তব পরিস্থিতি এবং সকল মানসিক দাবিসমূহ রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরবে। প্রয়োজনবোধে মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হবে। সমস্ত দেশ জানবে প্রতিবন্ধীরাও মানুষ, তারা সমাজের বাইরের কেউ নয়। তাদেরও ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অধিকার আছে রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাবার। আমরা প্রতিবন্ধী নই, আমরা মানুষ।

ব্য শুনতে হয় অনেক প্রতিবন্ধী স্বামীকে। অপরদিকে অবিবাহিত কোন মেয়ে প্রতিবন্ধীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে না বললেই চলে। যদিও বা আসে, তা হয় অযোগ্য নয়তো যৌতুকের বিনিময়ে। ইমরান তার অভিজ্ঞতা থেকেই বলে যে, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে কোন প্রতিবন্ধীর বিয়ে হলেও তা স্থায়ী হয় না।

ইমরান নিজে বিবাহিত। এক বন্ধুর বোনকে সে বিয়ে করছে। পূর্ব পরিচয় ছিল সেই পরিবারের সাথে। বিয়ের আগে কখনো কথা হয়নি বিয়ে সম্পর্কে। ইমরানের মা-ই একদিন তার একাকিত্ব ঘোঁচানোর জন্য ইমরানকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। মায়ের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য ইমরান স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে বিয়ে করার জন্য মনস্থির করে। ইমরান তার মায়ের সুখের জন্য নিজের জীবনটাকে বাজী রেখেছিল। মাকে দিয়ে সেই বন্ধুর বোনকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠালো। কন্যাপক্ষ যেহেতু ইমরানকে পূর্ব থেকেই চিনত, সেহেতু ভাল এবং যোগ্য ছেলে হিসেবে তারা রাজী হয় বিয়েতে। সংসার জীবনে ইমরান খুব সুখী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া রয়েছে। ইমরানের প্রতিবন্ধিতা সংসার জীবনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। স্ত্রী-স্বামীর প্রতিবন্ধতাকে কোন বাধা বলে মনে করেন না। স্বামীর প্রতি যথেষ্ট যত্নবান সে। এর অন্যতম কারণ, স্ত্রীর উপর সার্বিক দায়িত্ব এবং ভালবাসা ইমরান পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছে। এতকিছুর পরেও ইমরান মনে করে, যদি কোনদিন স্ত্রী তার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সামান্যতম মন্তব্য অথবা বিরূপ ভাব পোষণ করে তাহলে পরিস্থিতি কি হবে তা সে নিজেও জানে না।

ইমরানের একটি ইচ্ছা, যদি সে যথাযথ সাংগঠনিক এবং অর্থনৈতিক সহায়তা পায় তাহলে বাগেরহাটের সকল প্রতিবন্ধীকে একত্রিত করে একটি মহাসমাবেশ করবে। সেই সমাবেশে প্রতিবন্ধীদের বাস্তব পরিস্থিতি এবং সকল মানসিক দাবিসমূহ রাষ্ট্রের কাছে তুলে ধরবে। প্রয়োজনবোধে মিছিল সহকারে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হবে। সমস্ত দেশ জানবে প্রতিবন্ধীরাও মানুষ, তারা সমাজের বাইরের কেউ নয়। তাদেরও ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অধিকার আছে রাষ্ট্রের কাছে দাবি জানাবার। আমরা প্রতিবন্ধী নই, আমরা মানুষ।

রেহানার কথা

নাম তার রেহানা। চলন প্রতিবন্ধী দলের একজন সদস্য। বয়স ২৬ বছর। সুন্দরঘোনা গ্রামে তার জন্ম। পোলিওর কারণে তার নাম প্রতিবন্ধীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাবা নিতান্ত গরীব বলে তাকে ডাক্তার দেখাতে পারেননি। শুধুমাত্র মা একবার এক ফকিরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাতে কোন ফল হয়নি। ছোটবেলাতে তার যখন স্কুলে যাবার বয়স তখন পায়ের সমস্যা খুব একটা ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে আর লেখাপড়া করা হয়নি। বাবা-মাও কখনো লেখাপড়ার প্রতি গুরুত্ব দেয়নি। আজ মনে হয় তার পড়াশোনা করাটা খুবই দরকার ছিল।

রেহানারা চার ভাইবোন। ভাই দুজন ছোট। সংসারে একমাত্র আয়ক্ষম ব্যক্তি রেহানার বাবা। তিনি ভ্যানচালক। ভ্যান চালিয়ে সামান্য যা আয় হয়, তাই দিয়ে নয় সদস্যবিশিষ্ট বাবার সংসার চলে।

রেহানা তার নিজের জন্য এখন আর ভাবে না। ভাবে, ছেলেমেয়ে দু'টির কথা। তারা ভবিষ্যতে কিভাবে চলবে তা তার অজানা। মানুষের সন্তান যেভাবে বেড়ে ওঠে, ওরা হয়তো সেভাবে কোনদিনই বড় হতে পারবে না। বর্তমানে যে কষ্টে তারা দিন কাটায় তাতে মাঝে মাঝে রেহানার মরে যেতে ইচ্ছে করে। কারণ চোখের সামনে ছোট ছোট সন্তানদের এত কষ্ট তার সহ্য হয় না। মরণ হলে চোখের সামনে সন্তানদের এত কষ্ট আর দেখতে হতো না।

চার বছর পূর্বে রেহানার বিয়ে হয়েছিল। স্বামীর নাম খোকন মল্লিক। স্বামীর সংসারে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু সুখ ছিল। তাকে দেখেশুনেই বিয়ে করেছিল। রেহানার সকল কাজে সে সাহায্য-সহযোগিতা করত। এমনকি রেহানা গোসল করার পর স্বামী তার কাপড় পর্যন্ত ধুয়ে দিত। সুন্দর একটি স্বপ্ন সৃষ্টি হয়েছিল তাদের সংসারে। একটি মেয়ে হল। স্বপ্ন আরো ঘনিভূত হল। হয়তো একদিন মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করতে পারবে। কিছুদিন পর আবারও গর্ভে নতুন প্রাণের স্পন্দন টের পায়। রেহানা ভাবেন, এবার যদি একটি পুত্র সন্তান হয় তাহলে স্বামী তার ভালবাসায় আরও গভীর হবে। কারণ একটি মেয়েতো আছেই। এখন যদি একটি ছেলে হয় তাহলে দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের সংসার গড়বে। হোক না নিজে প্রতিবন্ধী। স্বামী তো মেনে নিয়েছেই। কিন্তু সেই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হতে খুব বেশী দেরী হল না। গর্ভে যখন নয় মাসের সন্তান তখন তার স্বামী

একদিন দিঘীরপাড় নামক স্থানে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মারা যায়। রেহানার সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। একেতো বিধবা, তার উপর একটি সন্তান কেবল হাঁটতে শিখেছে অপরটি গর্ভে। সর্বোপরি নিজে প্রতিবন্ধী।

বৈধব্যের যন্ত্রণা ও গঞ্জনা মাথায় নিয়ে রেহানা বাবার বাড়িতে ফিরে আসে। সেখানে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। সেই কাঙ্খিত পুত্রসন্তান এলো বটে, তবে এতিম হয়ে। যে সবচেয়ে বেশি খুশী হত, সে রেহানার স্বামী। সেই তো নেই রেহানার বুক ভেঙ্গে যায়। বাবার মৃত্যুর হাত ধরে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করল সেই সন্তানের নাম রেহানা রেখেছে দুখু মিয়া। আজ রেহানার মনে হয়, যে সন্তানকে ভবিষ্যতের আলো হিসাবে ভেবেছে সে সন্তান এসেছে দুঃখের ডালি সাজিয়ে। অতএব তার নাম দুখুমিয়া ছাড়া আর কি হতে পারে?

যেহেতু রেহানা বাবার বাড়িতে থাকে, সেহেতু বাবার আয়ের উপর তাকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হয়। ভাই দুইজন ছোট। তারা আয়-রোজগার করার মত বড় হয়নি। অবশ্য লেখাপড়াও করে না। মেজ ভাই রেহানার সাথে মাঝে মাঝে দুর্ব্যবহার করে বলে- 'নিজে চলতে পারে না, আবার দুজন জন্ম দিয়েছে।'

বড় বোনের বিয়ের পর একটি মেয়ে হলে তার স্বামী তাকে তালাক দেয়। সেও বাবার সংসারে আছে। বাবাকে মাঝে মাঝে সবচেয়ে ভাগ্যাহত বলে মনে হয়। দুটি মেয়েই বিয়ে দেবার পর বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা হয়ে তার সংসারে ফিরে এসেছে। সংগে তিনটি সন্তান। বাবার সে ভার এখন বহন করবার ক্ষমতা নেই। তার ঘাড়ের উপর সেই বোঝা চেপেছে। যদি এ মুহূর্তে বাবার কিছু হয়ে যায় তাহলে তাদের না খেয়েই মরতে হবে। তাদের অন্যরা হয়তো খেটে খেতে পারবে কিন্তু রেহানা? সেতো কারো কাছে গিয়ে কিছু চাইতেই পারে না। তা সত্ত্বেও পাড়া-প্রতিবেশীরা যথাসম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করে।

মাঝে মাঝে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা হয় রেহানার। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়া তার জন্য অসম্ভব। যেতে হলে রিক্সা দরকার। কিন্তু রিক্সাভাড়া কোথায়! তাই সেখানেও যাওয়া হয় না।

রেহানা তার নিজের জন্য এখন আর ভাবে না। ভাবে, ছেলেমেয়ে দু'টির কথা। তারা ভবিষ্যতে কিভাবে চলবে তা তার অজানা। মানুষের সন্তান যেভাবে বেড়ে ওঠে, ওরা হয়তো সেভাবে কোনদিনই বড় হতে পারবে না। বর্তমানে যে কষ্টে তারা দিন কাটায় তাতে মাঝে মাঝে রেহানার মরে যেতে ইচ্ছে করে। কারণ চোখের সামনে ছোট ছোট সন্তানদের এত কষ্ট তার সহ্য হয় না। মরণ হলে চোখের সামনে সন্তানদের এত কষ্ট আর দেখতে হতো না।

স্বেচ্ছানির্বাসিত মাকসুদ চাকলাদার

মাকসুদ চাকলাদার-এর বাড়ি রণবিজয়পুর। সদর উপজেলার কোলাহলের মাঝে নিতৃত জীবনযাপন করে। বাবা চাকলাদার মোকলেছুর রহমান। দুই বছর পূর্বে মারা গেছেন। মাকসুদরা চার ভাই এক বোন। মাকসুদের বয়স ২৩ বছর। সে সকলের ছোট। বাবা-মা, ভাই-বোনের বড় আদরের। কিন্তু সে আদর সে পায়নি।

বাবা ধন-সম্পত্তি যেটুকু করেছেন তাতে সন্তানদের কোন সমস্যা হবার নয়। বড় ছেলে সরকারি অফিসে ভাল চাকুরি করেন। মেঝ ছেলে ব্যবসায় এবং সেজ ছেলে পুলিশ বিভাগে চাকুরি করেন। একমাত্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে সেই কবে! সাজানো গোছানো একটা সংসার তার। শুধু মাকসুদই সকলের একমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ।

সুস্থ একটি শিশু হিসেবেই মাকসুদের জন্ম হয়। বছরখানেক বয়সের সময় তার প্রচণ্ড পাঁচড়া (ঘা) হয়। ডাক্তার তাকে ইনজেকশন এবং নীল রং-এর পটাশ জাতীয় ঔষধ খেতে দেন। তার বয়স যখন আড়াই বছর তখন তার অসুস্থতা ধরা পড়ে। প্রথম প্রথম সামান্য সমস্যা ছিল। কথা একটু একটু বেধে যেত। স্বাভাবিক শিশুদের মত চলাফেরা করতে সমস্যা হত। তখন তাকে শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের ডাক্তারদের মন্তব্য ছিল-রোগটি সম্ভবত প্যারালাইসিস। মাকসুদের বাবা-মা তখন খুব একটা গুরুত্ব দেন নাই। তারা ভেবেছিলেন, ভবিষ্যতে ঠিক হয়ে যাবে। এমন ধারণায় তাকে উন্নত কোন চিকিৎসা করানো হয়নি।

তারা অনেকেই জানে না যে তাদেরই পাড়াতে মাকসুদ নামে একটি প্রতিবন্ধী ছেলে আছে। অনেক জানা প্রতিবেশীও ভুলে গেছে তার নাম। কারণ সে এখন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী জীবন বেছে নিয়েছে। অনেকটা জীবন্মৃত প্রায়। হয়তো এভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে মাকসুদ নামের একটি অপূর্ণাঙ্গ মানবজীবন।

কিন্তু তাদের সকল ভাবনাকে ভুল প্রমাণিত করে মাকসুদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যেতে থাকে। প্রথমদিকে সমবয়সীদের সাথে খেলাধূলা করত। কিন্তু তার শারীরিক ত্রুটিগুলো যখন আরো তীব্র হতে লাগল তখন থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করল। সঙ্গী-সাথীরাও তাকে বিভিন্ন প্রকার মন্তব্য করে উত্যক্ত করতে শুরু করল। এতে তার মনের উপর খারাপ প্রভাব পড়তে শুরু করল। ফলে, দিনে দিনে সে মানসিক

ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে, হাত ও পায়ে জোর পায় না। ঠিকমত জোর দিয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হয়।

বর্তমানে সে নিজেকে একাকী ঘরে বন্দী রাখতে পছন্দ করে। অন্য কোন ভাইদের ঘরে কখনো সে যায় না। ক্ষুধা পেলেও সে কাউকে জানায় না। তার মা-ই তাকে নিজের থেকে খাবার খাওয়ায়। কখনো কাউকে বিরক্ত করে না। কোনকিছুর প্রতি তেমন আগ্রহ নেই। তবে গান শুনতে খুব ভালবাসে। তাইতো তার সেজ ভাই তাকে একটি রেডিও কিনে দিয়েছে। সেই রেডিও নিয়ে সে প্রায় সারাদিন ঘরে বসে গান শোনে। একটি বন্ধ ঘরই তার পৃথিবী। গান তাকে কতটা আনন্দ দেয় তা সে-ই বলতে পারে। নতুন জামা কাপড়ের প্রতিও তার আগ্রহ আছে বেশ। সদর রাস্তার পাশে বাড়ি হওয়ায় যখন মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতো তখন কোন পোষ্টার বা সিনেমার লিফলেট পেলে সযত্নে নিয়ে আসত। তার নিজের কক্ষের বেড়ায় লাগিয়ে রাখতো। কিন্তু এখন আর তা করে না। যখন ছবি লাগিয়ে রাখতো তখন সেই ছবির নায়ক-নায়িকার দিকে তাকিয়ে একা একা হাসতো। তার কল্পনার রাজ্যে স্থিরচিত্রকে সে আপন করে নিয়েছে। এতটা সুন্দর মানুষ হয়তো তার কাছে আর কেউ হয়নি। তার সবথেকে প্রিয়জন তার বোন। ছোটবেলা থেকেই বোন তাকে খুব আদর করে। এখন মাঝে মাঝে বোনের বাড়িতেই শুধু যেতে চায়। অন্য কোথাও নয়।

লেখাপড়া মাকসুদ একদম করেনি। কারণ, যখন স্কুলে যাবার বয়স শুরু হয়েছিল তখন তার অসুস্থতাও শুরু হয়। বাবা-মা তার অসুস্থতার কারণে তাকে স্কুলে পাঠাননি। বর্তমানে মায়ের ধারণা, যদি মানসিক অসুস্থদের স্কুলে যাবার সুযোগ থাকতো তাহলে তাকে পাঠানো যেত। কিন্তু তখন বাগেরহাটে কোন মানসিক স্কুল ছিল না।

মায়ের ইচ্ছা, মাকসুদকে নিয়ে সকলের সঙ্গে বসে মিলেমিশে খাবার খেতে। কিন্তু পারিবারিক পরিবেশ সে রকম নেই।

মাকসুদ বাচ্চাদের মতো এখনো ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতে চায়। কিন্তু পেরে ওঠে না। বাচ্চাদের সে খুব ভালবাসে। যদি কখনো কেউ বাচ্চাদের রাগ করে অথবা পিটুনি দেয় তাহলে তার খুব রাগ হয়। অথচ সে প্রতিবাদ করতে পারে না। নিরব প্রতিবাদে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মাকসুদের প্রতিবেশীদের অনেকে তাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে। কিন্তু পরিবারের কেউ তাতে কর্ণপাত করে না। কারণ, মাকসুদের সকল ভাইবোন আধুনিকতায় বিশ্বাস করে। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাদের বয়স ১০-১২ বছর, তারা অনেকেই জানে না যে

তাদেরই পাড়াতে মাকসুদ নামে একটি প্রতিবন্ধী ছেলে আছে। অনেক জানা প্রতিবেশীও ভুলে গেছে তার নাম। কারণ, সে এখন স্বেচ্ছায় গৃহবন্দী জীবন বেছে নিয়েছে। জীবন্মৃত-প্রায়। হয়তো এভাবেই একদিন শেষ হয়ে যাবে মাকসুদ নামের একটি মানবজীবন।

বিবর্ণ সবুজ

সবুজ একটি তাজা প্রাণের নাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। কেন হল না এই প্রশ্নের জবাব অনেক গভীরে। সেখানে পৌঁছানো সকলের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়। একটি কঠিন পারিবারিক ক্ষোভের দেয়াল তাকে আটকে রেখেছে।

সবুজের বাড়ি বাগেরহাটের সুন্দরঘোনা গ্রামে। বয়স ১৬-১৭ বছর। বাবা সাইফউদ্দিন শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজসেবী হিসাবে সুনামের অধিকারী। গণবিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। মা হেলেনা বেগম স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। অর্থাৎ নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে বাগেরহাটে তাঁর ভূমিকা অগ্রণী। যদিও তিনি একজন গৃহিনী ছাড়া বর্তমানে আর কিছুই নন।

সাইফ উদ্দিন এবং হেলেন বৈবাহিক জীবন শুরু করেন অনেক দেরিতে। তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম কামনার ধন সবুজ একজন প্রতিবন্ধী হয়ে পৃথিবীতে আসে। নিজের পায়ে ভর করে একবারেই দাঁড়াতে পারে না। হুইল চেয়ার, রিক্সা অথবা অন্যের কোলে চড়েই তাকে চলাফেরা করতে হয়। হাতের আঙ্গুলগুলো বাঁকানো। লেখার জন্য কোনভাবেই সহায়ক নয়। আর স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারেনা। বেশ কষ্ট হয়। বেধে যায় কথা। নিজের হাতে খেতে পারে না এবং প্রচুর খাবার থালার বাইরে পড়ে যায়।

যেহেতু বাবা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সেহেতু চিকিৎসার কোন প্রকার ত্রুটি করেননি। ফলাফল যে একেবারে শূন্য তা বলা যাবে না। কারণ, ইতিমধ্যে সামান্য উন্নতি হয়েছে তার। তবে তা উল্লেখ করার মত নয়। সেই চিকিৎসা তাকে প্রতিবন্ধীদের দল থেকে বের করে আনতে পারেনি।

বাবা-মা সচেতন বিধায় সন্তান প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও তাকে লেখাপড়া থেকে বিরত রাখেননি তারা। বাড়ির কাছে সুন্দরঘোনা স্কুলে তাকে নিয়মিত লেখাপড়া করিয়েছেন। একজন সঙ্গী তাকে সর্বদা সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত আছে। তবে ক্লাসে অথবা পরীক্ষার সময় সে লিখতে পারে না। একজন সাহায্যকারী নেয়। বর্তমানে সবুজ এসএসসি পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য এমন কোন নিয়ম রাখেনি যে, যদি কোন প্রতিবন্ধী নিজের হাতে লিখতে না পারে তাহলে মৌখিক অথবা লেখার সাহায্যকারী ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা দেওয়া যাবে। সবুজের বাবার সমাজের প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সচরাচর ওঠাবসা বিধায় তিনি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট পর্যন্ত সুপারিশ নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি একবাক্যে জবাব দিয়েছেন, 'দেশে এ ধরনের কোন নিয়ম নেই।' সবুজ এবং তার পরিবারের এখন প্রশ্ন, মানুষের জন্য আইন, নাকি আইনের জন্য মানুষ? যে আইন মানুষের কোন উপকারে আসে না, অথবা জীবনকে স্থবির করে দেয় অথবা সুন্দর ভবিষ্যতকে অন্ধকারে পরিণত করে দেয়, সেই আইনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

রাষ্ট্র প্রতিবন্ধীদের জন্য এমন কোন নিয়ম রাখেনি যে, যদি কোন প্রতিবন্ধী নিজের হাতে লিখতে না পারে তাহলে মৌখিক অথবা লেখার সাহায্যকারী একজন ব্যক্তি দ্বারা পরীক্ষা দেওয়া যাবে। সবুজের বাবার সমাজের প্রথম শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সচরাচর মেলামেশা বিধায় তিনি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট পর্যন্ত সুপারিশ নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি একবাক্যে জবাব দিয়েছেন, 'দেশে এ ধরনের কোন নিয়ম নেই।' সবুজ এবং তার পরিবারের এখন প্রশ্ন, মানুষের জন্য আইন, নাকি আইনের জন্য মানুষ? যে আইন মানুষের কোন উপকারে আসে না, অথবা জীবনকে স্থবির করে দেয় অথবা সুন্দর ভবিষ্যতকে অন্ধকারে পরিণত করে, সেই আইনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এতকিছুর পরেও সবুজের বাবা দমে যাননি। তিনি ছেলেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রয়োজনে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পর্যন্ত যাবেন বলে স্থির করেছেন। যদি আইনটি পাশ করানো যায় তাহলে সবুজের মত আরো অনেকে যারা নিজেরা লিখতে পারেনা কিন্তু বলতে পারে তারা পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবে। আর সেই নববিধানের যাত্রা শুরু হবে হয়তো সবুজকে দিয়ে। সেই আশায় বুক বেঁধে উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের কাছে ধর্ণা দিয়ে যাচ্ছেন। বাবা মনে করেন, দশ বছর বহুকষ্টে অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পড়াশোনা করার পর শেষে এসএসসি পরীক্ষা দিতে না পারলে সবুজ মানসিকভাবে ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়বে। বর্তমানে সবুজ সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে অথবা বলতে গেলে তার মা ভীষণভাবে ক্ষুদ্ধ হন। বিশেষ করে কোন সংগঠন অথবা এনজিও-র পক্ষ থেকে তাদের বাড়িতে গেলে এককথায় তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবার মত অবস্থা তিনি সৃষ্টি করেন। তিনি একজন শিক্ষিত মহিলা হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের দুশ্চিন্তায় সমাজের ব্যাপারে অনেকটা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তিনি মনে

করেন, সমাজ তার সন্তানের প্রতি অবিচার করছে। এর প্রতিবাদ সকলে মিলে করা উচিত। কিন্তু তা কেউ করছে না। অতএব, কেবল সবুজকে দেখতে এসে লাভ কি? রাষ্ট্র ও আইনের প্রতি অনেকটা ঘৃণা প্রকাশ করেও তিনি বিভিন্ন মন্তব্য করেন।

পাড়া প্রতিবেশী যারা অশিক্ষিত বা অসচেতন তারা মনে করে, সামাজিকভাবে সাইফ সাহেব অনেক অন্যায় করেছেন। তার প্রতিফলন সন্তানের মাধ্যমে তিনি পাচ্ছেন। অর্ধশিক্ষিত এবং মোল্লা শ্রেণীর লোকে বলে, বেশী বয়সে বিয়ে করে সন্তান ধারণ করলে এমনই ফল হয়। আর ডাক্তার কি বলেছেন তা জানা যায় নি তাদের কাছ থেকে। তবে বাবা-মা অথবা পরিবারের নিকট থেকে সন্তান হিসেবে সবুজের যতটুকু পাওনা তাতে এতটুকুও কমতি নেই। শুধু পাচ্ছে না সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে সবুজ নিজেও জানেনা সমস্যা কোথায়? তবে কি শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী হয়েছে বলেই এই বৈষম্য? কে দায়ি তার জন্য? এই প্রশ্নের জবাব জানেনা সবুজ, সবুজরা। তাইতো সবুজ আজ বিবর্ণ।

রানা এখন কোথায়

আলিম-উজ-জামান রানা, পিতা আদিল-উজ-জামান। বাড়ি রণবিজয়পুর গ্রামে। এ গ্রামের একটি পুরাতন ঐতিহ্যবাহী পরিবারে তার জন্ম। শিক্ষা, ধনসম্পদ, সামাজিক মর্যাদা সকল দিক থেকেই তার পরিবার উল্লেখ করার মত।

বর্তমানে তার বয়স প্রায় ৪০-৪২ বছর। বাম পায়ে পোলিও হয়েছিল সেই কবে, তা তার মনে নেই। অভিভাবকদের মতে, একেবারে শিশুকাল থেকেই তার পায়ে সমস্যা। এক পা খুঁড়িয়ে হাটে। চিকিৎসা করানো হয়েছিল বটে। তবে, কোন সুফল পাওয়া যায়নি। ওঝা-বৈদ্য দেখানো হলেও তারা মন্তব্য করেছে জ্বিনপরীর কারসাজী বলে।

শিক্ষার জন্য যথারীতি চেষ্টা চালালেও এসএসসি-এর উপর আর যাওয়া সম্ভব হয়নি তার। কারণ প্রতিবন্ধী হলেও দুষ্টুমীর চরম সীমায় পৌঁছেছিল রানা। সেই কারণেই লেখাপড়া হল না। একটি পায়ে সমস্য নিয়ে দৌড়, ঝাঁপ, লাফ, সাঁতার, ফুটবল ইত্যাদি করেনি এমন কোন কাজই নেই। অর্থাৎ প্রতিবন্ধিতা তাকে কোনভাবে আটকাতে পারেনি। ছোটবেলা খোঁড়া বলে কেউ কেউ তাকে কটুক্তি করলেও রানা সে সকল মন্তব্য উপেক্ষা করেছে নিতান্ত অবজ্ঞায়।

প্রতিবন্ধীদের সমস্যা নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে তিনি প্রথমে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন সেটি হলো, মানসিক জোর। কারণ মানসিক জোর না থাকলে কোন সহায়তাই কাজে আসবে না। যদিও মানসিক জোর নির্ভর করে যে সকল বিষয়ের উপর তার মধ্যে মানবাধিকার অথবা রাষ্ট্রীয় অধিকার খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

এলাকার সকল সমবয়সীদের সাথে একত্রে দলবেধে ক্লাব গড়ে তোলা থেকে শুরু করে ছাত্র রাজনীতিও করেছেন তিনি। তিন ভাই তিন বোন তারা। বাবার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ঘরে তার জন্ম। প্রথম মা মৃত্যুবরণ করলে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। প্রথম মায়ের এক ছেলে অর্থাৎ বড় এক সৎ ভাই আছে রানার। তবে, ওদের মধ্যে সম্পর্কের কখনও অবনতি হয়নি। বড় ভাইকে জমের মত ভয় এবং ওস্তাদের মত সম্মান করে পরিবারের সকলে। সৎ মা এবং সৎ ভাইবোন হিসেবে দেখে না সেই

ভাই- মা এবং তার সন্তানদের। তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন যথাযথভাবে। প্রতিবন্ধী ভাইয়ের প্রতি যতটা যত্নবান হওয়া উচিত তিনি এবং গোটা পরিবার ততটাই যত্নশীল।

এলাকায় স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তিনি একবার অংশগ্রহণ করেছিলেন। সকলের সমর্থন বিশেষ করে যুবক শ্রেণীর সমর্থনে তিনি মেম্বার হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। প্রতিবন্ধিতা তাঁকে জনপ্রতিনিধি হতে বিরত রাখতে পারেনি। এক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য এবং অর্থ তার জন্য খুবই সহায়ক ছিল।

অর্থনৈতিকভাবে তিনি নিজেই স্বচ্ছল। একাধিক ব্যবসা এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সমাজে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন তিনি। পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেকেই বিভিন্ন সমস্যার সময় তার কাছে নির্ভরতা এবং সহায়তার আশায় ছুটে যায়। তিনি তার সাধ্যমত সহায়তা করেন।

রানা খুলনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন। বিয়েতে কোন সমস্যা হয়নি তার প্রতিবন্ধিতা নিয়ে। কারণ, তার প্রচুর অর্থ এবং পারিবারিক প্রতিপত্তি আছে। যিনি তার সহধর্মীনী তারও অপছন্দের কোন কারণ ছিল না। সেখানেও বোধহয় অর্থই কারণ। এখন এক পুত্র সন্তানের জনক তিনি। বাড়িতে অন্য ভাইদের সঙ্গে মিলে একত্রে দোতলা দালান বানিয়ে সুখে বসবাস করছেন তিনি।

একজন প্রতিবন্ধী হয়েও সমাজের প্রায় সর্বস্তরে রানা চলাফেরা করেন শুধুমাত্র মেধা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের জোরে। অথচ দেশের প্রায় ১০% লোক প্রতিবন্ধীদের সারিতে থাকলেও রানার মত করে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনতে পারেনি। আর সেই সুযোগই বা কোথায়?

রানার কাছে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে তিনি প্রথমে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন সেটি হলো, মানসিক জোর। কারণ মানসিক জোর না থাকলে কোন সহায়তাই কাজে আসবে না। যদিও মানসিক জোর নির্ভর করে যে সকল বিষয়ের উপর তার মধ্যে মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারদান খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন।

নার্গিসের করুণ কাহিনী

নার্গিস পারভিন, বাবা শেখ জাবেদ আলী। বাড়ি সুন্দরঘোনা গ্রামে। বর্তমান বয়স ২৫ বছর। তার ডান পায়ে সমস্যা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখলে বোঝা যায় সে প্রতিবন্ধীদের দলের একজন। বয়স যখন দেড় বছর তখন তার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। তারপর থেকেই ডান পায়ের কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না। এজন্য ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালেও তাকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু সকল আশার মুখে ছাই ঢেলে নার্গিস প্রতিবন্ধীই রয়ে গেল। অনেক কবিরাজ, ফকিরও দেখানো হয়েছিল তাকে। সেই সনাতন মন্তব্য, 'জ্বীনের বদ নজর' অথবা 'বাও বাতাস' লেগেছে। যদিও নার্গিস এখন বুঝতে পারে যে সমস্যাটি পোলিও রোগের কারণে হয়েছে।

বাবা মোটামুটি স্বচ্ছল বলা চলে। বাড়িতে টিনের ঘর। মা-বাবা, ভাইবোনের বড় আদরের ধন ছিল নার্গিস। কিন্তু সেই সুখ নিজের ভুলের কারণে নিদারুণ দুঃখে পরিণত হয়েছে।

বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন যিনি তার নাম সরদার বাকের উল্লাহ। তার প্রেমে পড়ে যায় নার্গিস। প্রতিবন্ধিতাটুকু বাদ দিলে নার্গিসকে অপছন্দ করার মত আর কোন কারণ তার মধ্যে নেই। একবাক্যে সুশ্রী বলা যায়। কিশোর বয়সের প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা পালিয়ে বিয়ে করে।

বিয়ের ব্যাপারে নার্গিসকে কেউ কোন প্রকার সহায়তা করেনি। একদিন তারা বাস্ত বতার তাগিদে চট্টগ্রাম পাড়ি জমায়। স্বামী সেখানে মাছের ব্যবসা করত। নার্গিস নিজে গার্মেন্টসে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত কাজ করত। একটু সুখের আশায় তারা দুজনেই অক্লান্ত পরিশ্রম করতো। কিন্তু ভালবাসার নামে একজন প্রতিবন্ধী মেয়ের জীবন এমনভাবে নষ্ট করে দেবে তার স্বামী, তা সে জানতো না। তাইতো মাত্র এক বছরের সংসার জীবন ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে আসতে বাধ্য হয় নার্গিস।

চট্টগ্রামে নার্গিস যখন পাঁচ মাসের গর্ভবতী, তখন স্বামী তাকে সেখানে রেখে বাগেরহাটে চলে আসেন। বেশ কিছুদিন স্ত্রীর কোন খোঁজখবর রাখেন না তিনি। সেই চট্টগ্রামে নার্গিসের মামাতো ভাই (একজন ডাক্তার) থাকতেন। সেই মামাতো ভাইয়ের

সহায়তায় নার্গিসের মা নার্গিসের খোঁজ পান এবং তিনি নিজে গিয়ে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এতকিছু ঘটে যাবার পরও নার্গিসকে কেউ কিছু বলেনি। সামান্য তিরস্কারমাত্র করেছিল তার ভাইবোনেরা। নার্গিস জানে, ভুল সে করেছে। অতএব তার প্রাপ্য প্রায়শ্চিত্ত কিছুতো করতেই হবে!

তার বয়স যখন দেড় বছর তখন প্রচন্ড জ্বর হয়েছিল। তারপরই ডান পায়ের কিছু অংশ স্বাভাবিকভাবে কাজ করেনা। ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালেও তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সকল আশার মুখে ছাই ঢেলে নার্গিস প্রতিবন্ধীই রয়ে গেল। অনেক কবিরাজ, ফকিরও দেখানো হয়েছিল তাকে। সেই সনাতন মন্তব্য, 'জ্বীনের বদ নজর' অথবা 'বাও বাতাস' লেগেছে। যদিও নার্গিস এখন বুঝতে পারে যে রোগটি পোলিও রোগের কারণে হয়েছে।

আজ যখন নার্গিস একা একা সময় কাটায় তখন অতীতের সোনালী দিনগুলোর কথা ভাবে। নিজেকে কখনো প্রতিবন্ধী মনে করেন না সে। শুধুমাত্র হাঁটার সময় ছাড়া। বাগেরহাটের জাহানাবাদ স্কুলে পড়াশোনা করেছে সে। স্কুলে পড়ার সময় কারো কাছ থেকে কোন প্রকার বিরূপ আচরণ পায়নি। বরং অন্যান্য সহপাঠিনীর সঙ্গে মিশে সমানে খেলাধূলা, আড্ডা মেরেছে। একপায়ে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৭ সালে স্কুল প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায় থেকে ব্যাডমিন্টন খেলে মেডেল পেয়েছেন। এছাড়া কেরাম ও ভলিবলে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। অথচ কোথায় গেল সেই সোনালী দিনগুলো! শুধুমাত্র একটি ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে জীবনের গতি ঊর্দ্ধমুখী থেকে নিম্নমুখী হয়ে গেল।

বাবার বাড়িতে এসে তার একটি পুত্র সন্তান হয়। যার নাম মিজান। নিজের জীবনের কথা ভাবতে ভুলে গেছে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে। বাবার বাড়িতে থাকার সময় নার্গিস খবর পেয়েছে যে, তার স্বামী মা-বাবার চাপে পড়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। অবশ্য দ্বিতীয় বিয়েতে যৌতুক হিসেবে সে পেয়েছে বিশ হাজার টাকা। এ ঘটনা শুনে নার্গিস আদালতে মামলা দায়ের করে বিনাঅনুমতিতে দ্বিতীয় বিয়ে করার অভিযোগে। যদিও এখনো মামলার সুরাহা হয়নি। তবে, নার্গিস তার স্বামীকে শুধুমাত্র একটু শিক্ষা দিতে চায় এবং নিজে স্বামীর সংসারে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু তার স্বামীর ইচ্ছা থাকলেও শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রতিবন্ধী পুত্রবধূকে মেনে নিতে চান না। তাই তাদের ছেলেও পারে না নার্গিসকে ফিরিয়ে নিতে।

আজ যখন নার্গিস একা একা সময় কাটায় তখন অতীতের সোনালী দিনগুলোর কথা

ভাবে। নিজেকে কখনো প্রতিবন্ধী মনে করে না সে। শুধুমাত্র হাঁটার সময় ছাড়া। বাগেরহাটের জাহানাবাদ স্কুলে পড়াশোনা করেছে সে। স্কুলে পড়ার সময় কারো কাছ থেকে কোন প্রকার বিরূপ আচরণ পায়নি। বরং অন্যান্য সহপাঠিদের সঙ্গে মিশে সমানে খেলাধূলা, আড্ডা মেরেছে। একপায়ে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৭ সালে স্কুল প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে ব্যাডমিন্টন খেলে মেডেল পেয়েছেন। এছাড়া কেরাম ও ভলিবলে তার জুড়ি মেলা ভার ছিল। অথচ কোথায় গেল সেই সোনালী দিনগুলো! শুধুমাত্র একটি ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে জীবনের গতি ঊর্দ্ধমুখী থেকে নিম্নমুখী হয়ে গেল।

সে সকল দিনে পরিবারে তার কোন অবমূল্যায়নের প্রশ্নই ছিল না। সকল বিষয়ে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হতো। আজ নার্গিস নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে থাকে। কেউ কোন সহানুভূতির কথা বললেই তার করুণা মনে হয়। মানসিকভাবে নিজেকে খুব দুর্বল মনে হয়। নার্গিস মনে করে, কোন সংগঠনে যদি সে একটি কাজ জোগাড় করতে পারতো তাহলে হয়তো মনের জোর কিছুটা ফিরে পেতে পারতো। কারণ, ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য তার মতে, সামাজিক ও আর্থিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

গার্মেন্টস-এর কাজের পাশাপাশি নার্গিস আরো দুটি যোগ্যতা অর্জন করেছে নিজের চেষ্টায়। তাহলো, হাতের সেলাই এবং টাইপ। নার্গিস মনে করে, হাতের কাজ কখনো ফেলনা হয় না। কোন-না-কোন দিন হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে। নতুন করে পড়াশোনা করার আগ্রহটা সে একবারে হারিয়ে ফেলেনি। তার বিশ্বাস সেই সোনালী দরজার সন্ধান পেতে হলে অবশ্যই তাকে লেখাপড়া শিখতে হবে।

মাঝে মাঝে ভাবে, যেহেতু স্বামীর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়নি, সেহেতু হয়তো একদিন সে তার ভুল বুঝে তার কাছে ফিরে আসবে। অথবা তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও তার প্রতিবন্ধিতার অজুহাত প্রত্যাহার করে মেয়ের মত ঘরে তুলে নেবে।

বাবা এখন বেকার। দুইভাই চাকুরি করেন। তাদের আয়েই সংসার চলছে। নিজেকে এবং চোদ্দ মাস বয়সের ছেলেকে সেখানে নিতান্তই বোঝা মনে হয়। তাই নিজের প্রতিবন্ধিতাকে মোচন করতে এখন একটি কাজের সন্ধান করছে। কারণ, সে এসএসসি পাশ করেছে। সে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা দ্বারা বাকী জীবনের পথ চলতে চায়। আর নতুন করে কোন ভুল করা নয়।

পা হারা হারুন

হারুন-অর-রশিদ, বাড়ি সুন্দরঘোনা গ্রামে। বয়স ২০-২২ বছর। উঠতি বয়সের তরুণেরা যেভাবে বিপথে যায় হারুন সেইরকম বিপথগামী এক তরুণ। তবে শহুরে ভাষায় বিপথগামী বলতে যতটা মারাত্মক বোঝায় সেরকম কিছু না। যথাযথ শিক্ষার অভাবে ভিলেজ পলিটিক্স এবং দলীয় রাজনীতির শিকার সে। একটি রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন পর্যায়ের লাঠিয়াল হিসেবে সে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। পেছনে নেতাদের ভরসাবাণী তাকে উদ্বেল করে তুলতো। কিন্তু হারুণ জানতো না যে সে শুধুমাত্র দাবার গুটির মত ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রয়োজন ফুরালে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে।

'দিন এনে দিন খাওয়া' পরিবারের একমাত্র ছেলে হারুন। সঙ্গদোষে হোক, আর পরিবেশের কারণেই হোক, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এসএসসি-র দরজা পার হয়নি। এমনকি পিতাকে কখনো আর্থিক সহায়তা করবার মানসিকতাও গড়ে ওঠেনি তার। এমনি সময় হাতছানি দিয়ে ডাক পড়লো একটি রাজনৈতিক দলের ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবার জন্য। নেতাদের আশ্বাস, ভরসা তার সাহসকে বহুগুণ বর্ধিত করল। দিন যায়, মাস যায়, আর হারুণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সে ক্ষমতা কখনই তার গ্রামের বাইরে যায়নি। তার সমবয়সীগণ দেখল হারুন আর আগের হারুন নেই। তার কাছে অস্ত্র হয়তো নেই, তবে অস্ত্রের চাইতে ক্ষমতাধর নেতাগণ পেছনে রয়েছে। শুরু হলো হারুনের অনিয়ম যাত্রার পালা। মুরব্বিদের অমান্য করা, নিয়মকে অনিয়ম করা, আইন হাতে তুলে নেয়া, অল্পতে মারপিট করা, মিছিল-মিটিং-এ নেতৃত্ব দেওয়া প্রভৃতি কারণে হারুন গ্রামে সকলের বদনজরে পড়ে গেল। পথের কাঁটা সরাতে প্রতিপক্ষের লোকজন একদা অতর্কিত চড়াও হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হারুনের ডান পা কেটে ফেলল। সন্ত্রাসীর অন্ধকার রাস্তা থেকে

যদি কখনো সময় এবং সুযোগ আসে তাহলে আর একবার দেখে নেবে সেই নেতাদের, যারা তাকে ব্যবহার করেছে। যারা তাকে রাজনীতি করবার নামে সুস্থ জীবন থেকে অসুস্থ জীবনে নিয়ে এসেছে। পরিনামে তাকে ঠেলে দিয়েছে প্রতিবন্ধীদের কাতারে। নীরব প্রতিবাদের ভাষা তার চোখে-মুখে প্রকাশ পায়। কিন্তু বলবার কোন ক্ষেত্র অথবা অবস্থান নেই।

সুস্থভাবে হারুনের সুস্থ জীবনে ফেরা হল না। বর্তমানে হারুন সুস্থ জীবনযাপন করছে বটে, তবে প্রতিবন্ধীদের দলে নাম লিখিয়ে, বেশ মূল্য দিয়ে।

ডান পা কাটা পড়লে চিকিৎসার যে খরচ প্রয়োজন, তা তার নেতারা দেয়নি। হারুনের আত্মীয়স্বজন, গ্রামের কিছু লোক মিলে তার চিকিৎসা খরচ বাবদ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে।

এখন হারুন একটি নকল পায়ের উপর ভর করে হেঁটে চলে, বেড়ায়। ছোট একটি দোকান করেছে। নিতান্ত গোবেচারার মত জীবনযাপন করে। নকল পা নিয়ে হারুনের চলাফেরা করতে খুবই সমস্যা হয়। সহজভাবে চলতে পারে না। তার সে নেতৃবর্গ এখন আর তার কোন খবর নেন না। সাধারণ লোকজন মাঝে মাঝে বিরূপ মন্তব্য করে, হারুন শুনেও না শোনার ভাণ করে। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে, কখনো চুপ করে থাকে।

বিয়ে করেছে হারুণ। আত্মীয়ের মধ্যেই তার বিয়ে হয়েছে। যদিও নকল পা তার কিন্তু স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিরূপতা নেই। জেনেশুনেই তাকে গ্রহণ করেছে। পরিবারে সে যথেষ্ট সাহায্য করে। ছোট্ট দোকান কিন্তু সেখান থেকে যা আয় হয় তার সম্পূর্ণ অংশই পরিবারের জন্য সে ব্যয় করে। এখন আর বে-হিসেবী নয় সে।

খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, ভেতরে ভেতরে সে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত। এই সমাজের রাজনৈতিক নেতাদের মানবতাহীন কার্যকলাপের গতিপ্রকৃতি সে বুঝতে পারে এখন। ভাবখানা এরকম, যদি কখনো সময় এবং সুযোগ আসে তাহলে আর একবার দেখে নেবে সেই নেতাদের, যারা তাকে ব্যবহার করেছে। যারা তাকে রাজনীতি করবার নামে সুস্থ জীবন থেকে অসুস্থ জীবনে ঠেলে দিয়েছিল। পরিণামে তাকে প্রতিবন্ধীদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। নীরব প্রতিবাদের ভাষা তার চোখে-মুখে প্রকাশ পায়। কিন্তু তা প্রকাশের কোন ক্ষেত্র অথবা অবস্থান এখন আর খোলা নেই।

অধ্যায়-৬
আলোচনা ও করণীয়

এই গবেষণায় ৩০০ জন প্রতিবন্ধীদের মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা, দলগত আলোচনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ছাড়াও সরেজমিনে ২০ জন প্রতিবন্ধী, এদের পরিবার এবং পরিবেশ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত হবার জন্য একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এতে অনেকের আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রত্যাশার কথা রয়েছে। অনেকের জীবনের করুণ কাহিনীর রয়েছে বেদনাদায়ক বিবরণ। নির্মম বাস্তবতার মাঝেও অনেকের উচ্চারণে, পরিবার ও সমাজের প্রতিবন্ধীদের প্রতি মনোভঙ্গি, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবিক নয় আবার ক্ষেত্রবিশেষে সহমর্মীও বটে; এমন কথাও জানা গেছে।

আমাদের প্রত্যাশা-সমাজের সকল মানুষ প্রতিবন্ধীদের মানবিক ও মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করবেন। পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ইস্যুটিকে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবেচনা করলে সমাজের এ বিপুল জনসংখ্যা বোঝা বা আপদ মনে করার অবকাশ থাকবে না।

এ প্রসঙ্গে আমরা এদেশের বিশিষ্ট প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি প্রয়াত অধ্যাপক আহমদ শরীফের একটি রচনা থেকে উদ্ধৃত করতে পারি। '....আমরাই সওয়াবের অবচেতন বা সচেতন লোভে পড়ে এক কোটি বিশ লাখ লোককে ভিক্ষাজীবী করে রেখেছি। অথচ সমাজ এবং সরকার সচেতন ও সচেষ্ট হলে একজনও ভিক্ষাজীবী বা বেকার মিলবে না সমাজে। তারাও পরিচিত হবে না প্রতিবন্ধীরূপে, হবে না অনুকম্পার পাত্র-পাত্রী। তখন সমাজে মাত্র কিছু মানবিক প্রতিবন্ধীমাত্র থাকবে। ....সমাজ ও সরকার বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায়, সমাজ নানা সেবামূলক সমিতি, সংস্থা, সংঘ, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জাতীয় লজ্জাকর ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত রাখার জন্যে উদ্যম নিয়ে উদ্যোগী হয়ে সযত্ন প্রয়াসে আন্তরিকভাবে কাজে নামলে এ জাতীয় সমস্যার সমাধান হবে অচিরেই।' (কিছু বিশ্বাসের বাহ্যিক পূর্নবিবেচনা: আহমদ শরীফ)।

করণীয়

গবেষণা থেকে প্রতিবন্ধিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তাদের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যে বিষয়গুলো জরুরী ভিত্তিতে করণীয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে তা তুলে ধরা হলো:

- প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয় গড়ে তোলা। এই চিকিৎসালয়ে সকল যন্ত্রপাতি ও উপকরণে সজ্জিত থাকবে। শিশুকালে বা জন্মের পরপর কোন এলাকার শিশুর প্রতিবন্ধিতার লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে এ কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য সারা দেশে প্রচারণা চালাতে হবে। এটা স্থানীয় প্রশাসন বা কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলো করবে।
- প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে বিনামূল্যে এবং বেসরকারি ক্লিনিকে অর্ধমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি সরকারি Assistive device (যেখানে প্রতিবন্ধিদের জন্য বিভিন্ন সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈরী হয়) কারখানা গড়ে তুলে সহজলভ্য ও সকলের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার সুযোগ করে দেয়া।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য সারাদেশে স্কুল ও কারিগরি শিক্ষালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তাদের জন্য উপযোগী ক্যারিকুলাম ও অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা।
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সমসুযোগে চাকরির ব্যবস্থা ও চাকরির ক্ষেত্রে তাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধীদের বিনোদনের জন্য প্রতি জেলায় অন্তত একটি করে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা। এ কেন্দ্রে, ক্রিড়া, সংস্কৃতি ও পাঠাগারের ব্যবস্থা থাকবে।
- বাস, রেল ও উড়োজাহাজে প্রতিবন্ধীদের অন্তত ১০% আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং অর্ধেক ভাড়ায় যাতায়াতের বন্দোবস্ত করা। ভ্রমণকালে যানবাহন কর্মীরা প্রতিবন্ধীদের সহায়তাদানের মনোভাব গড়ে তোলা। রাস্তা পারাপারকালে প্রতিবন্ধীদের ট্রাফিক পুলিশের সহায়তার বিধান চালু করতে হবে।
- অফিসে, ভবনে চলাচলকালে প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী সিঁড়ি তৈরি করা এবং এরকম স্থানে কর্মরত কর্মীদের বাধ্যতামূলক সহায়তা দান।

- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার যেমন বাওবাতাস, জ্বীন-ভূতের আছর, পাপের ফসল ইত্যাদি অপধারণা নির্মূলের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।
- প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত অন্ধধারণা ও কুসংস্কার দূর করতে এবং তাদের জন্য পরিবারে ও সমাজে সহমর্মিতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমকে সচেতন করা।
- প্রতিবন্ধী, প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্য ও সমাজের অন্যান্যদের তথ্য সরবরাহ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রথমত কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমৃদ্ধ রেফারেন্স সেন্টার গড়ে তোলা; সেখানে প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে বই-পুস্তক, জার্নাল এবং কম্পিউটার, ভিডিও, অডিও, ইন্টারনেট সুবিধা ইত্যাদি থাকবে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশ যা অন্তত সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক হতে পারে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য সমাজে সকলের, বিশেষতঃ প্রতিবন্ধী পরিবার ও প্রতিবেশীদের আশ্বাস, ভরসা ও সহানুভূতির মনোভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- যেসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধিদের নিয়ে কাজ করছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার করতে হবে।
- সর্বোপরি, প্রতিবন্ধী আইন ও নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সমাজে এমন মনোভঙ্গি গড়ে তোলা যাতে করে স্বাভাবিক মানুষের মতো সামাজিক মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার ভোগ করে প্রতিবন্ধীরা নিজেদের মানুষ ভাবার মতো পরিবেশ পায়।

সংযুক্তি ১

জাতিসংঘ
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ এবং ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities & Optional Protocol

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদ

ভূমিকা

এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহ,

(ক) জাতিসংঘ ঘোষনার মূলনীতি অনুযায়ী সকল মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্য এবং সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহকে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়,

(খ) স্বীকৃতি দেয় যে জাতিসংঘ তার সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষনাপত্র ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে ঘোষনা ও সম্মতি প্রদান করেছে যে কোনরকম ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে ঐসকল সনদ ও ঘোষনাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারি,

(গ) সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীনতা, অবিভাজ্যতা, আন্তনির্ভরশীলতা এবং আন্তসম্পর্ক ও সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৈষম্যহীনভাবে এগুলোর পূর্ণ উপভোগের নিশ্চয়তা দৃঢ়তার সাথে পুণর্ব্যক্ত করে,

(ঘ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, সকল প্রকার বর্ণ বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অত্যাচার ও অন্যান্য নিষ্ঠুরতা, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি বিরোধী সনদ, শিশু অধিকার সনদ এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন আছে,

(ঙ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতা একটি বিকাশমান ধারণা এবং প্রতিবন্ধিতা হলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত ও পরিবেশগত বাধার মধ্যকার আন্তসম্পর্কের পরিণতি, যা অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সমাজে পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাধাগ্রস্ত করে,

(চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সম-সুযোগকে এগিয়ে নিতে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরের নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ, প্রণয়ন ও মূল্যায়নকে প্রভাবিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি (ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন) ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুযোগের

সমতাবিধান সংক্রান্ত প্রমিত বিধিতে (স্ট্যান্ডার্ড রুল্‌স) বর্ণিত মূলনীতি ও নীতি নির্দেশনার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

(ছ) টেকসই উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৌশলসমূহের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধিতার বিষয়সমূহকে মূলস্রোতে নিয়ে আসার তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেয়,

(জ) আরও স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য ব্যক্তি-মানুষের চিরন্তন মর্যাদা ও মূল্যের লংঘন,

(ঝ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বৈচিত্র্যকে পুনর্বার স্বীকৃতি দেয়,

(ঞ) নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মানবাধিকার সমুন্নতকরণ ও সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

(ট) উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, বিভিন্ন আইন, উদ্যোগ ও চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বজুড়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অব্যাহতভাবে সমাজের সমমর্যাদাবান সদস্য হিসেবে পূর্ণ অংশগ্রহণে বাধার সম্মুখীন ও তাদের মানবাধিকার লংঘিত,

(ঠ) সকল দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান উন্নীত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

(ড) সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও বৈচিত্র্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও সম্ভাবনাময় মূল্যবান অবদান এবং তাদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগ ও পূর্ণ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সমাজে অংশীদারিত্বের বোধ বৃদ্ধি পাবে; মানবীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হবে,

(ঢ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তি স্বাধীকার ও স্বাধীনতা এবং তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়,

(ণ) বিশ্বাস করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সকল নীতি ও কর্মসূচিসহ নীতি ও কর্মসূচী-বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া উচিত,

(ত) জাতিগত, বর্ণগত, লিঙ্গীয়, ভাষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা ভিন্নমতের কারণে, জাতীয়তা, জাতিগোষ্ঠীগত, উৎপত্তিগত, সম্পত্তিগত, জন্মগত, বয়সভিত্তিক ও অন্যান্য কারণে বহুমুখি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে,

(থ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা ঘরে-বাইরে সর্বত্র প্রায়শই অধিকতর সহিংসতা, শারীরিক আঘাত বা নির্যাতন, অযত্ন বা অবহেলা, অন্যায় আচরণ বা বৈষম্যের ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে,

(দ) স্বীকৃতি দেয় যে প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অন্যান্য শিশুদের সাথে সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার পূর্ণ উপভোগের অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বাস্তবায়নে শিশু অধিকার সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা রয়েছে,

(ধ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ কর্তৃক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগকে সমুন্নতকরণের সকল প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের সামাজিক অসমতা দূর করার দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়,

(ন) বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ যে দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন, এই বাস্তবতাকে গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে ও এ কারণে প্রতিবন্ধী মানুষদের উপর দারিদ্রের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়,

(প) বিশ্বাস করে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে জাতিসংঘ চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও মূলনীতি এবং মানবাধিকারের আইনী সুরক্ষাব্যবস্থার[১] বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য, বিশেষ করে, সশস্ত্র সংঘাত ও বিদেশী দখলদারিত্বের সময়ে,

(ফ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের পূর্ণ উপভোগে সক্ষম করবার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেয়, যাতে তারা অবকাঠামোগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে সুযোগ সুবিধা পায় এবং তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে,

(ব) গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি এবং তার নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে স্বীকৃত সকল মানবাধিকারের প্রসার ও সেগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে,

(ভ) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক একক এবং তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা প্রাপ্তির অধিকারি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পরিবার যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ ও সম অধিকার উপভোগে অবদান রাখতে সক্ষম হয়, তার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ও সহায়তা পাওয়া উচিত,

---

১ *Human rights instruments*

(ম) দৃঢ়ভাবে মনে করে যে, উন্নয়নশীল ও উন্নয়ন-অর্জিত সকল দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা ও সমুনড়বত করতে একটি বিশদ ও সুসংবদ্ধ আন্তর্জাতিক সনদ ব্যাপক সামজিক বঞ্চনা দূর করতে এবং নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের জন্য সম-সুযোগ এনে দিতে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে,

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে এই মর্মে একমত যে,

ধারা-১
অভিষ্ট লক্ষ্য

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূর্ণ ও সমান মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার চর্চা সমুন্নত, সুরক্ষা ও নিশ্চিতকরণ এবং তাদের চিরন্তন মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায় ।

ধারা-২
সংজ্ঞা

এই সনদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য :

"যোগাযোগ" বলতে বুঝাবে সকল ভাষা, লেখ্য রূপ, ব্রেইল, স্পর্শ যোগাযোগ, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, সহজে ব্যবহারোপযোগী[২] কম্প্যুটার-ভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম; সেইসাথে লিখিত, শ্রুতিগোচর মাধ্যম, সরল ভাষা, মানব পাঠক এবং যোগাযোগের সহায়ক ও বিকল্প মাধ্যম ও প্রকরণসমূহ এবং ব্যবহার উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

"ভাষা" বলতে বুঝাবে বাচনিক ও ইশারা ভাষা এবং অন্যান্য ধরণের অবাচনিক ভাষা;

"প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য" অর্থ হল প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যে কোন ভেদাভেদ, বর্জন অথবা নিষেধাজ্ঞা, যার উদ্দেশ্য বা পরিণতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক অথবা অন্য যেকোন ক্ষেত্রের সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের স্বীকৃতির

২ accessible

উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা ব্যর্থ হয়। চাহিদার ভিন্নতার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণের[৩] প্রত্যাখ্যান করাসহ সকল ধরণের বৈষম্য এর অন্তর্ভূক্ত হবে।

"প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ" বলতে বুঝাবে প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করে প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করা;

"সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা"[৪] বলতে বুঝাবে উৎপাদিত পণ্য, পরিবেশ, কর্মসূচি ও সেবাসমূহের পরিকল্পনা, যা কোন রকমের অভিযোজন বা বিশেষায়িত নকশার প্রয়োজন ছাড়াই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের ব্যবহার-উপযোগী হবে। এই "সকলের জন্য উপযোগী পরিকল্পনা" প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণকে বাদ দিয়ে প্রণীত হবে না।

ধারা-৩
সাধারণ মূলনীতি

এই সনদের মূলনীতি হবে :

ক) ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন;

খ) বৈষম্যহীনতা;

গ) পূর্ণ ও কার্যকর সমাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা;

---

৩ reasonable accommodation এর কিছু বাংলা প্রতিশব্দ বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার হলেও বলতে গেলে এর কোনটিই যথাযথ অর্থ প্রকাশ করে না। প্রতিবন্ধিতা অধিকার আন্দোলনে জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত এই ধারণাটির অর্থ সুস্পষ্টভাবে সনদেই বলা আছে। তবে ইংরেজী থেকে এক কথায় প্রকাশ করা যথেষ্ট সহজ নয় । ধারণাটির সাথে মিল রয়েছে জেন্ডারের আলোচনায় practical gender needs এর সাথে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়গত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রয়োজন বিবেচনায় এনে তার স্বাচ্ছন্দের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবেশে পরিবর্তন-পরিমার্জন করা, যাতে সে বিনা বাধায় সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার অন্যদের মতই সমানভাবে উপভোগ করতে পারে। এতে করে তার জন্য বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছন্দ ও উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এটা না হওয়া অব্দি অ-প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতিষ্ঠা করা ভাষা 'ওরা পারে না', ' পারবে না' - এসব চলতেই থাকবে। অ-প্রতিবন্ধী মানুষের তৈরি বিদ্যমান পরিবেশে পদে পদে বাধাগ্রস্ত প্রতিবন্ধী মানুষ তার মত করে দুনিয়ার যে পরিবর্তন চায়, তার উপযোগী পরিবেশ গড়তে চায়, সনদে সেই দাবিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

৪ universal design কে কেউ কেউ সার্বজনীন নকশা বলে থাকেন। তবে এটি একটি পরিকল্পনার ধারণা। এই পরিকল্পনা মানুষের সকল ভিন্নতা এবং ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার কথা মনে রাখবে। কেবল ইমারত নির্মাণ নয়, সকল পরিকল্পনা যেন এই বৈশিষ্টের হয়।

ঙ) সুযোগের সমতা;

চ) সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার;

ছ) নারী পুরুষের সমতা;

জ) প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশমান সামর্থ্যের এবং তাদের আত্মপরিচয়ের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

ধারা-৪
সাধারণ বাধ্যবাধকতা

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে কোনরকম বৈষম্য ব্যতিরেকে পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত ও উৎসাহিত করবে। এই লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা হলো:

ক) এই সনদে স্বীকৃত সকল অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সকল যথার্থ আইনগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল আইন, কার্যপ্রণালী, প্রথা ও চর্চার সংস্কার অথবা বিলুপ্তির জন্য বিধান প্রণয়নসহ সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ) সকল নীতি ও কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার সুরক্ষা ও তার উন্নয়ন বিবেচনা করা;

ঘ) এই সনদের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আইন অথবা চর্চা থেকে বিরত থাকা এবং সরকারি কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন এই সনদ অনুযায়ী পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা;

ঙ) ব্যক্তি, সংস্থা অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য পরিহার করার জন্য সকল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

চ) এই সনদের ধারা ২ নম্বর ধারার বর্ণনা অনুসারে সার্বজনীন দ্রব্য, সেবা, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করবে, যাতে ন্যূনতম সম্ভাব্য সংস্কার ও খরচে এ কাজগুলো এমনভাবে করা যায়, যেন এগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদা পূরণ করে; এগুলোর সহজলভ্যতা ও ব্যবহার উৎসাহিত করার জন্য সাধারণ মান ও নির্দেশনা তৈরিতে সকলের জন্য উপযোগী নকশার অনুসরণ উৎসাহিত করা;

ছ) কম খরচে পাওয়া যায় এমন প্রযুক্তির দিকে অগ্রাধিকার দিয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা বা গবেষণায় উৎসাহ দেয়া ও উন্নয়ন করা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের

উপযোগী তথ্য ও যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, চলাচলের সহায়ক উপকরণ, যন্ত্র ও সহায়ক প্রযুক্তিসহ নতুন প্রযুক্তিসমূহ সহজলভ্য ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা;

জ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে চলাচলের যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি, সেই সাথে নতুন প্রযুক্তিসমূহ ও অন্যান্য প্রকার সহায়তা, সহায়ক সেবা ও সুবিধা সম্পর্কে সহজলভ্য ও সহজে বোধগম্য তথ্যাবলি সরবরাহ;

ঝ) এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ দ্বারা নিশ্চিতকৃত সহায়তা ও সেবাসমূহ সুচারুভাবে প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ উৎসাহিত করা।

২. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের বিষয়ে প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র, উত্তরোত্তরভাবে এই অধিকারসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন অর্জনের জন্য, এই সনদের অন্তর্ভূক্ত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য বাধ্যবাধকতাসমূহ ক্ষুন্ন না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কর্মকাঠামোর ভেতরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহে তার বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. এই সনদের বাস্তবায়নের জন্য আইন ও নীতিমালার উন্নয়ন ও প্রয়োগ, এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সাথে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবে এবং তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট করবে। এক্ষেত্রে শিশু প্রতিবন্ধীদের সংশ্লিষ্টতাও তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে।

৪. এই সনদের কোন কিছুই কোন শরীক রাষ্ট্রের আইন বা সেই রাষ্ট্রে বলবৎ আন্তর্জাতিক আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার বাস্তবায়নে অধিকতর উপযোগী কোন ব্যবস্থার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কোন আইন, সনদ, বিধান বা রীতির উপর ভিত্তি করে গৃহীত কোন মৌলিক মানবিক অধিকার, এই সনদের কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বা ঐ রাষ্ট্রে বলবৎ থাকলে, যা এই সনদে স্বীকার করা হয়নি বা কম গুরুত্বের সাথে স্বীকার করা হয়েছে এই অজুহাতে তার উপর কোন সীমাবদ্ধতা আরোপ হবে না বা তা খর্ব করা যাবে না।

৫. এই সনদের বিধিবিধান কোন রকম সীমাবদ্ধতা বা ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের[৫] সব অংশেই প্রযোজ্য হবে।

৫ Federal States অর্থে।

ধারা-৫
সমতা ও বৈষম্যহীনতা

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, আইনের দৃষ্টিতে ও অধীনে সকল ব্যক্তি সমান এবং কোন প্রকার বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকেই সমান আইনী সুরক্ষা ও সুবিধা ভোগ করবার অধিকারি।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে সকল প্রকার বৈষম্য রোধ করবে এবং যে কোন প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সমান ও কার্যকর আইনী সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

৩. সমতা সমুন্নতকরণ ও বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগি পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাগ্রহণ নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রকৃত সমতা বর্ধন বা অর্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ এই সনদের শর্তাবলীর অধীনে বৈষম্য বলে বিবেচিত হবেনা।

ধারা-৬
প্রতিবন্ধী নারী

১. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশুরা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার এবং এই প্রেক্ষিতে তারা যাতে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান ও পূর্ণ উপভোগ করতে পারে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. এই সনদে উল্লেখিত সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা যেন প্রতিবন্ধী নারীরা পূর্ণ মাত্রায় চর্চা ও উপভোগ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী নারীদের সার্বিক উন্নয়ন, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-৭
প্রতিবন্ধী শিশু

১. প্রতিবন্ধী শিশুরা যেন অন্যান্য শিশুদের মতই সমানভাবে সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য শরীক রাষ্ট্র সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সকল কার্যক্রমে শিশুর সামগ্রিক কল্যাণকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিত হবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র সকল প্রতিবন্ধী শিশুর স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে, অন্যান্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

ধারা-৮
সচেতনতা বৃদ্ধি

১. শরীক রাষ্ট্র অনতিবিলম্বে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কার্যকর ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে:

ক) পারিবার পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা করবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক সকল ধরণের সনাতনী ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও ক্ষতিকর চর্চার অবসানে সচেষ্ট হবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে;

২. এ লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকবে :

ক) কার্যকর জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালু করা ও অব্যাহত রাখা। এই প্রচারাভিযান এমনভাবে তৈরি হবে, যাতে :

(১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের বিষয়গুলো আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়;

(২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ;

(৩) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা, মেধা ও পারদর্শীতা এবং কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রাপ্তিকে উৎসাহিত করে;

খ) শৈশব থেকেই সকল শিশুর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকারের প্রতি সম্মানমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

গ) এই সনদের অভিষ্ট লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উৎসাহিত করবে।

ধারা-৯
সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার :

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে শরীক রাষ্ট্র, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ভৌত পরিবেশ, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ জনসাধারণের জন্য নগর ও গ্রামীণ উভয় এলাকায় প্রাপ্ত অন্যান্য সব সুবিধা ও সেবাসমুহে অন্যান্যদের মত সমসুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ সকল ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত ও দূর করা; যা অপরাপর সকল বিষয়সহ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হবে :

ক) ভবন, সড়ক, যানবাহন ও অন্যান্য সুবিধাদি যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আবাসন, চিকিৎসা সেবা ও কর্মক্ষেত্রসহ অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ ও বহিরাঙ্গন সুযোগ-সুবিধা।

খ) তথ্য, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিন ও জরুরি সেবাসহ সকল সেবাসমুহ।

২. এছাড়াও শরীক রাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা হলো :

ক) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সকল সুবিধা ও সেবাপ্রাপ্তির ন্যুনতম মান ও নির্দেশিকা তৈরি, তার আইনী স্বীকৃতি ও প্রচার এবং পরিবীক্ষণ করবে;

খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ও প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও সেবাসমুহ যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে তা নিশ্চিত করবে;

গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;

ঘ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবনসমুহে ব্রেইল পদ্ধতিতে এবং সহজে পড়া ও বোঝা যায় এমনভাবে সঙ্কেত স্থাপন করবে;

ঙ) জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ভবন ও বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তি ও ব্যবহার সহজীকরণের জন্য গাইড, পাঠক ও পেশাদার ইশারা ভাষার দোভাষীসহ সরাসরি সহায়তা ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করবে;

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রকারের যথাযথ সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহিত করবে;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য ইন্টারনেটসহ নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্তি ও ব্যবহার উৎসাহিত করবে;

জ) প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অবাধে ব্যবহারযোগ্য[৬] তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিকল্পনা[৭], উনড়বয়ন, উৎপাদন ও বিতরণ উৎসাহিত করবে, যেন তা ন্যুনতম খরচে পাওয়া যায় ।

ধারা-১০
জীবনের অধিকার

শরীক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করছে যে, প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগতভাবে জীবনের অধিকার আছে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন অন্যান্যদের মত পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে ।

ধারা-১১
ঝুঁকিপূর্ণ ও মানবিক জরুরি অবস্থা

আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসহ সকল আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুসারে শরীক রাষ্ট্র সশস্ত্র সংঘাত, মানবিক জরুরি অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাসহ সকল ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

ধারা-১২
সমান আইনি স্বীকৃতি

১. শরীক রাষ্ট্র দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে ।

২. শরীক রাষ্ট্র স্বীকার করবে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করবেন ।

৩. আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

৪. শরীক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত যথার্থ ও কার্যকর রক্ষাকবচ প্রণয়ন এবং প্রয়োগে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করবে । এরূপ রক্ষাকবচ আইনী কর্তৃত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে গৃহীত ব্যবস্থাদি ব্যক্তির অধিকার, ইচ্ছা ও পছন্দের ক্ষেত্রে যেন পরস্পর স্বার্থ-বিরোধী না হয় এবং অযাচিত প্রভাবমুক্ত থাকে তা নিশ্চিত করবে । এই রক্ষাকবচ যেন ব্যক্তির নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি হয়, ন্যুনতম

---

৬ accessible অর্থে ।
৭ design অর্থে ।

সম্ভব সময়ের মধ্যে প্রযুক্ত হয় এবং তা যেন একটি সুযোগ্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচার বিভাগীয় সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত নিরীক্ষিত হয় তাও নিশ্চিত করবে। যেসকল ব্যবস্থাদি ব্যক্তির স্বার্থ ও অধিকারকে প্রভাবিত করে তার মাত্রা ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেন এই রক্ষাকবচগুলো তৈরি হয়।

৫. এই ধারার বিধান অনুযায়ী শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকারি হওয়া, তাদের নিজেদের আর্থিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাংক ঋণ, বন্ধকী ঋণ ও অন্যান্য ধরণের আর্থিক ঋণ পেতে অপরাপর সকলের মত সমানাধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের সম্পত্তির অধিকার থেকে জবরদস্তির মাধ্যমে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৩
সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য পদ্ধতিগত ও বয়স-উপযোগী সুবিধাসহ সাক্ষ্যপ্রদান, তদন্ত ও প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে সকল আইনি কার্যপ্রণালীতে তাদের কার্যকর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং অন্যান্যদের মত সমতার ভিত্তিতে কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য কার্যকরভাবে সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্র পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষসহ বিচার বিভাগে কর্মরতদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৪
ব্যক্তির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা

১. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন :

ক) ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার উপভোগ করে;

খ) বেআইনিভাবে বা জবরদস্তির মাধ্যমে যেন তারা স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। স্বাধীনতা খর্ব হলে তা অবশ্যই আইন অনুমোদিত পদ্ধতিতে হতে হবে। প্রতিবন্ধিতা কোনক্রমেই স্বাধীনতা খর্বের কারণ হবে না।

২. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোন প্রক্রিয়ায় যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা খর্ব হয়, তাহলে তারা যেন অন্যন্যদের মতই সমানভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের চাহিদার প্রতি

সংবেদনশীল হয়ে এই সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালা অনুযায়ী যেন সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ধারা-১৫
নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্তি

১. কোন ব্যক্তিকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ চিকিৎসা অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বিশেষত, কোন ব্যক্তিকেই তার স্বেচ্ছা-সম্মতি ছাড়া চিকিৎসার বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু করা যাবেনা।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের উপর যে কোন নির্যাতন কিংবা হিংস্র, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর কোন আচরণ বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য শরীক রাষ্ট্র অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সবধরণের কার্যকর আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১৬
শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণকে ঘরে-বাইরে লিঙ্গ-নির্বিশেষে সব ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে সুরক্ষার জন্য শরীক রাষ্ট্র সকল যথাযথ আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক, শিক্ষামূলক বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২. সব ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের পরিবার ও তত্ত্বাবধানকারিদেরকে লিঙ্গ ও বয়সের প্রতি সংবেদনশীল থেকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদানে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেইসাথে শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা এড়ানো, চিহ্নিতকরণ ও এ সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করতে সহায়তার জন্য তথ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করাসহ সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে সুরক্ষার সেবাসমূহ বয়স-ভিত্তিক, লিঙ্গ-ভিত্তিক ও প্রতিবন্ধিতাভিত্তিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল।

৩. শরীক রাষ্ট্র সকল ধরণের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সেবার জন্য পরিচালিত সকল সুবিধা ও কর্মসূচি স্বাধীন কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।

৪. যেকোন ধরনের শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের শারীরিক, বুদ্ধিগত ও মানসিক স্বাস্থ্য পুণরুদ্ধার, পুণর্বাসন ও তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে শরীক রাষ্ট্র সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাসহ সকল যথার্থ

ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই পুণরুদ্ধার ও মূল স্রোতে নিয়ে আসা এমন এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঘটবে যা ব্যক্তির লিঙ্গ ও বয়স-ভিত্তিক চাহিদানুযায়ী তার সুস্বাস্থ্য, কল্যাণ, আত্মসম্মান, মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র সমুন্নত রাখে।

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির উপর শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা সনাক্তকরণ, তদন্ত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বিচার নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্র নারী ও শিশু-বান্ধব আইন ও নীতিমালাসহ কার্যকর আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

ধারা-১৭
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা

সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার আছে।

ধারা-১৮
চলাচল ও জাতীয়তার স্বাধীনতা

১. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের চলাচলের স্বাধীনতা, নিজ আবাসস্থল ও জাতীয়তা নির্বাচন করার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবে ও সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ :

ক) কোন জাতীয়তা অর্জন ও পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না করা হয়;

খ) প্রতিবন্ধিতার কারণে যেন চলাচলের স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে প্রয়োজনীয় জাতীয়তার সনদ অথবা পরিচয়সূচক অন্যান্য সনদ অর্জন করা, অধিকারী হওয়া ও ব্যবহার করা অথবা প্রাসঙ্গিক কোন কাজে যেমন বিদেশ গমনে ব্যবহার করতে বঞ্চিত না হন;

গ) নিজের দেশসহ যেকোন দেশ থেকে অন্য দেশে গমনাগমনের অধিকার সংরক্ষণ করেন;

ঘ) জবরদস্তিমূলকভাবে অথবা প্রতিবন্ধিতার কারণে নিজ দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হন;

২. প্রতিবন্ধী শিশুরা জন্ম গ্রহণের পরপরই নিবন্ধিত হবে, জন্মের সাথেই একটি নাম ও জাতীয়তার অধিকারী হবে এবং যতদূর সম্ভব, মাতাপিতার পরিচয় জানা ও তাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ভোগ করবে।

ধারা-১৯
স্বাধীন বসবাস ও সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার

এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহ, অন্যান্যদের মত সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের পছন্দ অনুযায়ী সমাজে বসবাস করার সম-অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের এই অধিকারের পুর্ণ উপভোগ বাস্তবায়ন করতে এবং সমাজে তাদের পূর্ণ একীভূতিকরণ ও অংশগ্রহণের জন্য কার্যকর ও যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সেই সাথে নিশ্চিত করবে যে :

ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের নিজ আবাসস্থল এবং তারা কোথায় ও কাদের সাথে বসবাস করবেন তা অন্যান্যদের মত সমানভাবে বাছাই করার সুযোগ বিদ্যমান এবং তারা কোন বিশেষ আবাসন ব্যবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য নন।

খ) প্রয়োজনীয় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সহায়তাসহ সমাজ জীবনে বসবাস ও একীভূত হবার জন্য এবং সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা অথবা পৃথকীকরণ রোধ করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের বিভিন্ন গৃহভিত্তিক, আবাসিক ও অন্যান্য সামাজিক সহায়তামূলক সেবা প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

গ) সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যমান সামাজিক সেবা ও সুবিধাসমূহ সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান থাকবে। এসব সেবা ও সুবিধা তাদের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে।

ধারা-২০
ব্যক্তির চলাচলের অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ নিজেরা যাতে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারেন, শরীক রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে যেসমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো:

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পছন্দ অনুযায়ী, সময়মত এবং সুলভ মূল্যে তাদের ব্যক্তিগত চলাচলে সহায়তা করা;

(খ) মানসম্মত চলাচল-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ, সহায়ক প্রযুক্তি এবং চলাচল ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে মানব-সহযোগিতা যেন সুলভ মূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পেতে পারেন, তার জন্য সহায়তা করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তাদের সাথে কর্মরত সহায়ক-কর্মীদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঘ) যারা সচলতা-সহায়ক যন্ত্র, উপকরণ ও সহায়ক প্রযুক্তি প্রস্তুত করেন, তাদেরকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সচলতার সকল দিক বিবেচনা করতে উৎসাহিত করা;

ধারা-২১
মতামত ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন তাদের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার চর্চা করতে পারেন, শরীক রাষ্ট্র তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সেই সাথে, অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ যেন স্বাধীনভাবে তাদের পছন্দ অনুযায়ী সকল ধরনের তথ্য ও ধারনা চাইতে, পেতে এবং বিনিময় করতে পারে সে জন্যও এই সনদের ২ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা হলো :

(ক) সর্বসাধারনের জন্য প্রচারিত সকল তথ্য প্রতিবন্ধিতার সকল ধরণ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাছেও যথোপযুক্ত ব্যবহার-উপযোগী পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়মত ও সম-মূল্যে প্রদান করা;

(খ) দাপ্তরিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদানুযায়ী ইশারা ভাষা, ব্রেইল, কর্ম-সহায়ক ও বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতিসহ সকল ব্যবহার উপযোগী যোগাযোগের উপায়, ধরণ ও পদ্ধতির স্বীকৃতি ও সহায়তা প্রদান করা;

(গ) ইন্টারনেটসহ অন্যান্যভাবে সর্বসাধারণের জন্য সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী উপায়ে তথ্য ও সেবা প্রদান করতে আহ্বান করা;

(ঘ) গণমাধ্যম ও ইন্টারনেটে তথ্য সরবরাহকারিদেরকে তাদের সেবাসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার-উপযোগী করতে উৎসাহিত করা;

(ঙ) ইশারা ভাষার স্বীকৃতি ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করা।

ধারা-২২
ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

১. বসবাসের স্থান কিংবা অবস্থা নির্বিশেষে কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার গৃহে, পরিবারে বা যোগাযোগ বা অন্যান্য ধরণের তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপ বলপূর্বক, বে-আইনী অনুপ্রবেশ অথবা অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না। তার সম্মান ও সুনামের উপরও কোনরূপ বে-আইনী আক্রমন করা যাবে না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ ধরণের হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ থেকে আইনী সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে;

২. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

ধারা-২৩
গৃহ ও পারিবারের অধিকার

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিবাহ, পরিবার, পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে, অন্যান্যের সাথে সমতার ভিত্তিতে, বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। এর মাধ্যমে যেন :

ক) বিবাহযোগ্য বয়সের সকল প্রতিবন্ধী আগ্রহী ব্যক্তির মুক্ত ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও পরিবার গঠনের অধিকার স্বীকৃতি পায়;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন ও দায়িত্বশীলভাবে সন্তান সংখ্যা ও জন্ম-বিরতি নির্ধারণ, বয়স-অনুযায়ী প্রজনন ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। এই অধিকার চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি যেন তাদের কাছে সহজলভ্য হয়।

(গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে শিশুসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রজনন উর্বরতা বজায় রাখা নিশ্চিত হয়।

২. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য শিশুদের অভিভাবকত্ব, দত্তক গ্রহণ এবং শিশু ও তার সম্পত্তির হেফাজত কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনে বিদ্যমান এ ধরণের অন্য যে কোন বিধানের অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করবে। এক্ষেত্রে শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে হবে। শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে শিশু লালন-পালনের দায়িত্ব উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পারিবারিক জীবনলাভের সম-অধিকার নিশ্চিত করবে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য এবং শিশুর প্রতিবন্ধিতা গোপন করা, তাকে পরিত্যাগ করা, তার প্রতি অবহেলা ও তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা প্রতিরোধের জন্য শরীক রাষ্ট্র শিশু প্রতিবন্ধী ও তাদের পরিবারকে আগেভাগে বিস্তারিত তথ্য, সেবা ও সমর্থন প্রদান করবে।

৪. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে কোন শিশুকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না, যদি না উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রচলিত আইন অনুযায়ী নিশ্চিত হয় যে, এই বিচ্ছিন্নতা শিশুটির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। পিতামাতার যেকোন জনের বা উভয়ের কিংবা শিশুর যে কারোর প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনভাবেই শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।

৫. কোন শিশু প্রতিবন্ধীকে তার নিকটতম পরিবার উপযুক্ত যত্ন নিতে না পারলে শরীক রাষ্ট্র শিশুটিকে বৃহত্তর পারিবারিক গণ্ডির মাধ্যমে যত্ন প্রদানের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে বিফল হলে তার সমাজের মধ্যেই পারিবারিক আবহে যত্ন প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-২৪
শিক্ষা

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে। বৈষম্যহীন ও সম-সুযোগের ভিত্তিতে এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শরীক রাষ্ট্র সব স্তরে একটি একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করবে। যার উদ্দেশ্য হবে:

(ক) মানুষ হিসাবে সকল সম্ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্ম-মূল্যের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ শক্তিশালী করা;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব, মেধা, সৃজনশীলতা এবং তাদের মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার বিকাশ;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য সমর্থ করে তোলা।

২. এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে :

(ক) প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন ব্যক্তি যেন সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ না পড়ে। প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন শিশু যেন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত না হয়;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন তার সমাজের সকলের মত সমানভাবে একটি একীভূত, মানসম্পন্ন অবৈতনিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়;

গ) ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী তার স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগি পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা যেন গ্রহণ করা হয়;

ঘ) সাধারন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য থেকেই যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্যকর শিক্ষা-সহায়ক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়;

ঙ) সার্বিক একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সহায়তা প্রদান করে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেটি সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৩. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষায় এবং সমাজের সদস্য হিসেবে পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণে সমর্থ করে তুলতে ব্যক্তিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে। এই লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যার মধ্যে রয়েছে :

ক) ব্রেইল পদ্ধতি, বিকল্প লিপি, যোগাযোগের জন্য বিকাশমান ও বিকল্প মাধ্যম, উপায় ও শৈলীর ব্যবহার শিক্ষা, পরিচিতি ও চলাচলের দক্ষতা অর্জন, সাথী-সহায়তা এবং নিবিড়পরামর্শ সহায়তা প্রদান করা;

খ) ইশারা ভাষা শেখায় সহায়তা করা এবং বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির ভাষাগত পরিচয়কে সমুন্নত করা;

গ) যে সকল ব্যক্তি, বিশেষত যেসকল শিশু দৃষ্টি, বাক-শ্রবণ ও শ্রবণ-দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী, তাদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় যোগাযোগের পদ্ধতি ও উপায়ের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা, যেন তা সর্বোচ্চ শিক্ষাগত ও সামাজিক বিকাশ ঘটায়।

৪. এই অধিকার নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ, ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতিতে পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে কর্মরত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এই প্রশিক্ষণে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক সচেতনতা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য যোগাযোগের বিকাশমান ও বিকল্প পদ্ধতি, উপায় ও শৈলীর মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণের ব্যবহারকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৫. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বৈষম্যহীনভাবে ও অন্যান্যদের সাথে সমানভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বয়স্ক শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগি পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

ধারা-২৫
স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনরূপ বৈষম্য না করে শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বাধিক অর্জনযোগ্যমানের স্বাস্থ্য লাভের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক পূনর্বাসনসহ লিঙ্গ-ভিত্তিক সামাজিক অসমতার প্রতি সংবেদনশীল স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুনির্দিষ্টভাবে শরীক রাষ্ট্র:

ক) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে একই ধরণ, একই গুণ ও মানসম্পন্ন বিনামূল্যের বা স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ ও সেবা প্রদান করবে। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই কর্মসূচি ও সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবন্ধিতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। ত্বরিৎ শনাক্তকরণ, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিশু ও প্রবীণসহ সকলের অধিকতর প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকি হ্রাস ও প্রতিরোধ এই সেবায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

গ) গ্রামীণ এলাকাসহ সর্বত্র যতদূর সম্ভব গ্রহীতার নিজ-এলাকাতেই এই স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্যান্যদের মত সম-মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের জন্য পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। সরকারি বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও নৈতিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকার, আত্মমর্যাদা, স্বাধিকার এবং বিশেষ চাহিদা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের অবাধ ও সচেতন-সম্মতির ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে;

ঙ) স্থানীয় আইন অনুযায়ী স্বাস্থ্য বীমা ও জীবন বীমার ব্যবস্থা করে এবং তা ন্যায্য ও যৌক্তিকভাবে প্রদান করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য দূর করবে;

চ) প্রতিবন্ধিতার কারণে খাদ্য ও পানীয় অথবা স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সেবা প্রদানে বৈষম্য বিলোপ করবে।

ধারা-২৬
আবাসন ও পূণর্বাসন

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ যেন সাথী-সহযোগিতাসহ সর্বাধিক মাত্রায় আত্মনির্ভরশীলতা, পূর্ণ শারীরিক, মানসিক, সামজিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হতে পারে এবং অংশগ্রহণ বজায় রাখতে পারে, শরীক রাষ্ট্র সে বিষয়ে কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই লক্ষ্যে, শরীক রাষ্ট্র বিশেষত, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও সামাজিক সেবা খাতে সর্বসমন্বিত আবাসন ও পূণর্বাসন সেবা ও কর্মসূচিসমূহ এমনভাবে সংগঠিত, সম্প্রসারিত ও শক্তিশালি করবে, যাতে এই সেবা ও কর্মসূচিসমূহ :

ক) যতদূর সম্ভব প্রারম্ভিক পর্যায়ে এবং আলাদা-আলাদা ব্যক্তিচাহিদা ও শক্তি-সামর্থ্যের বহুমাত্রিক-জ্ঞান-ভিত্তিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে শুরু হয়।

খ) সেবামূলকভাবে সমাজের সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ ও একীভূত হতে সহায়তা করে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কাছে তা সহজলভ্য হয় এবং এই সেবা ও

সুবিধাসমূহ যেন গ্রামাঞ্চলসহ তাদের নিজ বসতির যতদূর সম্ভব নাগালের মধ্যে থাকে।

২. শরীক রাষ্ট্র আবাসন ও পুণর্বাসন সেবায় নিয়োজিত পেশাজীবী ও কর্মীদের প্রারম্ভিক ও চলমান প্রশিক্ষণের প্রসারে সহযোগিতা করবে।

৩. শরীক রাষ্ট্র আবাসন ও পূণর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রস্তুতকৃত সহায়ক উপকরণ ও প্রযুক্তি, এর সহজলভ্যতা, জ্ঞান ও ব্যবহার বিকশিত করবে।

ধারা-২৭
কর্ম ও কর্মসংস্থান

১. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মে-নিযুক্ত হবার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে পড়ে মুক্তভাবে পছন্দকরা কিংবা শ্রম বাজারে ও কর্ম পরিবেশে স্বীকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য উন্মুক্ত, গ্রহণীয় এবং তাদের জন্য উপযোগী কাজ করে জীবিকা অর্জনের সুযোগের অধিকার। শরীক রাষ্ট্র আইন প্রণয়নসহ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতা অর্জনকারিদের জন্য কাজ করার অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ তৈরি ও বাস্তবায়ন করবে, এর সাথে আছে :

ক) কর্মে নিযুক্তির শর্তাবলী, নিয়োগ ও কর্মসংস্থান, চাকুরির চলমানতা, পেশাগত উন্নতি এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশসহ সকল ধরণের কর্মসংস্থানে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্য বিলোপ করবে;

খ) সম সুযোগ ও সমান কাজের জন্য সমান ভাতা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্ম-পরিবেশ, নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা এবং ক্ষোভ প্রশমনসহ কাজে ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ পেতে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সুরক্ষা করবে;

গ) অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের শ্রম ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চা নিশ্চিত করবে;

ঘ) সাধারণ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিসমূহে, কর্মনিযুক্তি পরিষেবায় এবং বৃত্তিমূলক ও চলমান প্রশিক্ষণে কার্যকর অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সক্ষম করে তুলবে;

ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য শ্রম বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও পেশাগত উন্নতি সাধন করবে। সেইসাথে চাকুরি অনুসন্ধান, প্রাপ্তি, বহাল থাকা এবং পূণর্নিযুক্তিতে সহায়তা দেবে;

চ) আত্ম-কর্মসংস্থান, ব্যবসায়-উদ্যোগ, সমবায় গঠন এবং কারো নিজস্ব ব্যবসায় চালু করবার সুযোগ সুবিধাদির উন্নয়ন ঘটাবে;

ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সরকারি চাকুরি খাতে নিয়োগ দান করবে;

জ) ইতিবাচক পদক্ষেপ কর্মসূচি, উৎসাহ ভাতা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদিসহ যথাযথ নীতিমালা ও ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

ঝ) কর্মস্থলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের চাহিদার ভিন্নতার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে;

ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শ্রম বাজারে কর্ম-অভিজ্ঞতা অর্জন উৎসাহিত করবে;

ট) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বৃত্তিমূলক ও পেশাগত পূণর্বাসন, কর্মে ধরে-রাখা এবং পুণরায় কাজে যোগ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি উৎসাহিত করবে;

২. শরীক রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ নয় এবং অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তারা জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম হতে সুরক্ষিত।

ধারা-২৮
সন্তোষজনক জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা

১. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের নিজেদের ও তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান এবং জীবনযাপনের সন্তোষজনক মানের ক্রমাগত উন্নয়নের স্বীকৃতি দেবে। শরীক রাষ্ট্র এই সকল অধিকার অর্জনে সহায়তা দেবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় তার জন্য রক্ষাকবচ তৈরি করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

২. শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সামাজিক সুরক্ষা এবং তা উপভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে যেন বৈষম্য না হয় সে অধিকারের স্বীকৃতি দেবে। সেজন্য এই সকল অধিকার অর্জন ও সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে, যার মধ্যে রয়েছে:

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সুপেয় পানীয় জলের পরিষেবা পাবার সমানাধিকার এবং যথাযথ ও সাধ্য অনুযায়ী পরিষেবা, উপকরণ ও প্রতিবন্ধিতার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী ও কন্যাশিশু এবং প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষামূলক ও দারিদ্র্য দূরীকরণমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করা;

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও তাদের দারিদ্র-পীড়িত পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, সুপরামর্শ, আর্থিক সহায়তা এবং বিশ্রাম সেবাসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিবন্ধিতা-বরাদ্দে অধিকার নিশ্চিত করা ।

(ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য গণ-আবাসন কর্মসূচির সুবিধা নিশ্চিত করা ।

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা ও কর্মসূচিতে সম-অধিকার নিশ্চিত করা ।

ধারা-২৯
রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ

শরীক রাষ্ট্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক অধিকার ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গের মতই সমতার ভিত্তিতে তা উপভোগের সুযোগের নিশ্চয়তা প্রদান করবে এবং :

ক) নিশ্চিত করবে যে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সরাসরি কিংবা অবাধে বেছে নেয়া প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ কার্যকর ও পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও জনজীবনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান এবং নির্বাচিত হবার অধিকার ও সুযোগ ভোগ করবে । এক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে রাষ্ট্র :

(১) নিশ্চিত করবে যে, ভোট প্রদানের পদ্ধতি, সুবিধাদি এবং উপকরণাদি যথোপযুক্ত, বাধাহীন, বোধ্যগম্য ও অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী;

(২) কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়াই নির্বাচনে ও গণভোটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেবার অধিকার এবং নির্বাচনে অংশ নেবার, কার্যকরভাবে দপ্তর পরিচালনা এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে, যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সে অনুযায়ী সহায়ক ও নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করবে;

(৩) নির্বাচক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অবাধে মতামত প্রকাশ এবং এই লক্ষ্যে, যেখানে প্রয়োজন, তাদের অনুরোধে, তাদের নিজেদের পছন্দের কাউকে সহায়তার জন্য সাথে নিয়ে ভোট প্রদানে অনুমতির নিশ্চয়তা প্রদান করবে ।

খ) সক্রিয়ভাবে একটি পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বৈষম্যহীনভাবে এবং অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে জন-জীবনে কার্যকর ও পরিপূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং জন-জীবনে তাদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করবে, এর মধ্যে রয়েছে :

(১) বেসরকারি সংগঠন এবং দেশের জনগণ ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড ও তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ;

(২) আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠন তৈরি ও তাতে যোগদান ।

ধারা-৩০
সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ

১. শরীক রাষ্ট্র অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দেবে । শরীক রাষ্ট্র উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ :

ক) তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত সাংস্কৃতিক উপকরণ পায় ও তা উপভোগ করতে পারে;

খ) তাদের জন্য যথোপযুক্তভাবে প্রস্তুতকৃত টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা, চলচ্চিত্র, মঞ্চনাটক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উপভোগ করতে পারে;

গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা পরিষেবার স্থান, যেমন, মঞ্চনাটক, জাদুঘর, চলচ্চিত্র, গ্রন্থাগার ও পর্যটন পরিষেবা এবং যতটা সম্ভব, স্মৃতিসৌধ ও জাতীয় সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানে সহজে যেতে পারে এবং তা উপভোগ করতে পারে ।

২. শুধু ব্যক্তিগত উপকারের জন্য নয়, সার্বিক সমাজিক উন্নয়নের জন্য শরীক রাষ্ট্র যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে, যাতে করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের সৃজনশীল, শিল্পীসুলভ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্ভাবনার বিকাশ ও তা ব্যবহারের সুযোগ পায় ।

৩. শরীক রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে যুতসই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে, যে সকল আইন মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষা করছে, তা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক উপকরণ ব্যবহারে ও উপভোগে কোনরূপ অযৌক্তিক বা বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে ।

৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে ইশারা ভাষা ও ইশারা ভাষাগোষ্ঠির সংস্কৃতিসহ তাদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণে সক্ষম করে তুলতে শরীক রাষ্ট্র নিম্নলিখিত লাগসই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবে:

(ক) মূলধারার খেলাধুলার সকল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে সম্ভব সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-উপযোগি খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড আয়োজন, উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ করবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সঠিক শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ বরাদ্দ উৎসাহিত করবে (গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধুলা, বিনোদন ও পর্যটন স্থলে বিনা বাধায় প্রবেশ ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করবে;

(ঘ) অন্যান্য শিশুদের মতই প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল-ভিত্তিক নিয়মিত কর্মকাণ্ডসহ সাধারণ খেলাধুলা, বিনোদন, অবকাশ ও ক্রিড়ামূলক কর্মকাণ্ডে সমান অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করবে;

(ঙ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনোদন, পর্যটন, অবকাশ ও ক্রীড়ামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সংগঠনের পরিষেবা প্রাপ্তি ও উপভোগ নিশ্চিত করবে।

ধারা-৩১
পরিসংখ্যান ও উপাত্ত সংগ্রহ

১. এই সনদ কার্যকর করার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শরীক রাষ্ট্র নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পরিসংখ্যানগত ও গবেষণালব্ধ উপাত্তসহ যথাযথ তথ্য সংগ্রহে কাজ করবে। এই তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষনাবেক্ষণের প্রক্রিয়া :

(ক) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের একান্ত বিষয় এর প্রতি শ্রদ্ধা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনসহ, আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকবচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;

(খ) পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও ব্যবহার মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও নৈতিক মূলনীতি সুরক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২. এই ধারা অনুসারে সংগৃহিত তথ্য পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত করতে হবে এবং এই সনদের অধীনে শরীক রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতার বাস্তবায়ন মূল্যায়নে সহায়তার এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ তাদের অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতার মখোমুখি হয়, তা চিহ্নিত ও মোকাবেলা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে;

৩. শরীক রাষ্ট্র এই সকল পরিসংখ্যান প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্যদের জন্য তার প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

ধারা-৩২
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

১. শরীক রাষ্ট্র এই সনদের অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয়-পর্যায়ের প্রচেষ্টার সমর্থনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নবয়ন ও বিকাশের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেবে। এক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট আন্ত র্জাতিক এবং আঞ্চলিক সংগঠন ও সুশীল সমাজ, বিশেষকরে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের সংগঠনগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই পদক্ষেপসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে :

ক) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গকে সংশ্লিষ্ট করে এবং তাদের জন্য এর সুফল নিশ্চিত করে;

খ) তথ্য, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং অনুসরণীয় দৃষ্টান্তের বিনিময়সহ যেন সক্ষমতা-উন্নয়নে সহায়তা ও সমর্থনদান করে;

গ) গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের প্রাপ্তি ও ব্যবহারে সহযোগিতা যেন উৎসাহিত করে;

ঘ) সহজলভ্য ও ব্যবহার-উপযোগি সহায়ক প্রযুক্তিসমূহের বিনিময় এবং উপভোগ উৎসাহিত করাসহ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে যেন যথাযথ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে।

২. এই ধারার বিধানসমূহ এই সনদের অধীনে প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্রের নিজ-নিজ বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অনাগ্রহ সৃষ্টি করবে না।

ধারা-৩৩
জাতীয় বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১. শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়ন-সংশ্লিষ্ট বিষয় তদারকির জন্য সরকারের নিজস্ব সাংগঠনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করবে। বিভিন্ন খাত ও পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পাদনে সরকারের মধ্যে একটি সমন্বয়-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অথবা নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেবে।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের আইনী ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুযায়ী নিজ-নিজ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে এই সনদের বাস্তবায়ন উৎসাহদান, সুরক্ষা ও পরিবীক্ষণ করতে, যথোপযুক্ত এক বা একাধিক স্বাধীন ব্যবস্থাসহ, একটি কর্মকাঠামো সক্রিয় করা, শক্তিশালী করা, নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করবে। এই ধরণের ব্যবস্থা নিযুক্ত বা প্রতিষ্ঠার সময় শরীক রাষ্ট্র মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে জাতীয়

প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থা ও কার্যকারিতা-সংশ্লিষ্ট মৌলনীতিসমূহ বিবেচনায় আনবে।

৩. সুশীল সমাজ, বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারি সংগঠনসমূহ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হবে ও পূর্ণ অংশগ্রহণ করবে।

ধারা-৩৪
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটি

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক একটি কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হবে (পরবর্তীকালে এটি "কমিটি" হিসেবে নির্দেশিত হবে), যেটি এই ধারায় প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে;

২. এই সনদ বলবৎ হবার সময় বার জন বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে। সনদে অতিরিক্ত ষাটটি অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদনের পর আরো ছয়টি সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ আঠার সদস্য-বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হবে।

৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ দায়িত্বে কাজ চালিয়ে যাবেন এবং তাঁরা সুউচ্চ নৈতিক মানসম্পন্ন হবেন। এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে তাঁরা স্বীকৃত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন। প্রার্থী মনোনয়নে শরীক রাষ্ট্রকে এই সনদের ৪ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ শরীক রাষ্ট্রের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সমানুপাতিক ভৌগোলিক বন্টন, বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা ও প্রধান আইন ব্যবস্থাসমূহের প্রতিনিধিত্ব, ভারসাম্যমূলক লিঙ্গীয় প্রতিনিধিত্ব এবং অভিজ্ঞ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ বিবেচনায় আনা হবে।

৫. শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের সভায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিজেদের নাগরিকদের মধ্য থেকে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে কমিটির সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হবেন। ওই সকল সভায় শরীক রাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে। শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট এবং ভোটদাতা শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ কমিটির জন্য নির্বাচিত হবেন।

৬. এই সনদ বলবৎ হবার তারিখের ছয় মাস পার হবার আগেই প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি নির্বাচনের ন্যূনতম চার মাস পূর্বে, জাতিসংঘের মহাসচিব শরীক রাষ্ট্রসমূহকে চিঠির মাধ্যমে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন জমা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাবেন। মহাসচিব এর পর এভাবে মনোনীত ব্যক্তিবর্গের

নাম মনোনয়নদানকারি শরীক রাষ্ট্রসমূহের নাম উল্লেখ-পূর্বক বর্ণানুক্রমিকভাবে তালিকাবদ্ধ করবেন এবং এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের নিকট পেশ করবেন।

৭. কমিটির সদস্যবৃন্দ চার বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাঁরা কেবল একবার পুনর্নির্বাচনের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত কমিটির সদস্যবর্গের মধ্যে ছয় জন সদস্যের মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ হবার সাথে-সাথে শেষ হয়ে যাবে। প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরই ছয় সদস্যের নাম সভার সভাপ্রধান কর্তৃক এই ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে লটারির মাধ্যমে বাছাই করা হবে।

৮. কমিটির ছয়জন অতিরিক্তি সদস্যের নির্বাচন এই ধারার সংশ্লিষ্ট অনুবিধি অনুসারে নিয়মিত নির্বাচনের সময়েই অনুষ্ঠিত হবে।

৯. যদি কমিটির কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন বা পদত্যাগ করেন কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি আর তাঁর কর্তব্য পালনে সক্ষম না হন, সেক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্র তাঁর স্থলে এই ধারার অনুবিধিতে বর্ণিত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে সংশ্লিষ্ট মেয়াদের বাকিসময় কাজ করতে আরেকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ প্রদান করবে।

১০. কমিটি এর কর্মপরিচালনা পদ্ধতির বিধিমালা প্রতিষ্ঠা করবে।

১১. জাতিসংঘের মহাসচিব প্রারম্ভিক সভা আহ্বান করবেন এবং এই সনদের অন্তর্গত কমিটির কার্যকর কর্মপরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।

১২. সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের শর্তাবলীর ভিত্তিতে এবং কমিটির দায়িত্বের গুরুত্বের বিবেচনায় জাতিসংঘের সম্পদ থেকে ভাতা গ্রহণ করবেন।

১৩. কমিটির সদস্যবৃন্দ জাতিসংঘের সুবিধাভোগ ও দায়মুক্তি সনদের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত জাতিসংঘের মিশনের বিশেষজ্ঞবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদি ও দায়মুক্তির সুযোগ পাবেন।

ধারা-৩৫
শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদন

১. প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বলবৎ হবার দুই বছরের মধ্যে এই সনদের অধীনে তার বাধ্যবাধকতা কার্যকর করতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র সেই প্রেক্ষিতে অর্জিত অগ্রগতি উল্লেখ-পূর্বক জাতিসংঘের মহাসচিবের মাধ্যমে কমিটির নিকট একটি বিশদ প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহ পরবর্তীতে ন্যুনতম প্রতি চার বছরে একটি এবং কমিটির অনুরোধে যে কোন সময় সনদ-বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩. কমিটি প্রতিবেদনে উল্লেখ্যনীয় বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪. কোন শরীক রাষ্ট্র কমিটির নিকট প্রাথমিক বিশদ প্রতিবেদন পেশ করে থাকলে তাকে পরবর্তী প্রতিবেদনে পূর্বে উল্লেখিত তথ্যাবলী পূনরায় উল্লেখ করতে হবে না। কমিটির কাছে পেশ করার জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ একটি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে এই সনদের ৪ নম্বর ধারার ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের যথাযথ বিবেচনা সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

৫. প্রতিবেদনে এই সনদের বাধ্যবাধকতা পূরণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারি উপাদানসমূহ ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করতে হবে।

ধারা-৩৬
প্রতিবেদন বিবেচনা

১. কমিটি প্রতিটি প্রতিবেদনই বিবেচনায় আনবে। কমিটি তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী প্রতিবেদনের ওপর নির্দেশনা ও সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করে সেগুলা সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে। শরীক রাষ্ট্র পছন্দসই যেকোন তথ্য যোগ করে কমিটির কাছে উত্তর পাঠাতে পারবে। কমিটি এর পরেও শরীক রাষ্ট্রের কাছ থেকে এই সনদ বাস্তবায়নের সাথে প্রাসঙ্গিক কোন তথ্য জানতে চেয়ে অনুরোধ করতে পারবে।

২. যদি কোন শরীক রাষ্ট্র প্রতিবেদন পেশ করায় লক্ষ্যণীয়রূপে বিলম্ব করে, তাহলে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষা করতে নোটিশ পাঠাবে। নোটিশ দেবার তিন মাসের ভেতর প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এরূপ পর্যালোচনা করতে অনুরোধ করবে। এর জবাবে শরীক রাষ্ট্র প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন পেশ করলে সেক্ষেত্রে এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

৩. জাতিসংঘের মহাসচিব সকল শরীক রাষ্ট্রের কাছে প্রতিবেদনসমূহ প্রেরণ করবেন।

৪. শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ-নিজ দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করবে এবং এইসকল প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশমালা জানতে জনগণকে উৎসাহিত করবে।

৫. কমিটি কারিগরি পরামর্শ বা সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী বিশ্লেষণ ও সুপারিশসহ শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিবেদনসমূহ বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘের তহবিল ও কর্মসূচি এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রেরণ করবে।

ধারা-৩৭
কমিটি ও শরীক রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃসহযোগিতা

১. প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র কমিটিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে এবং এই কমিটির সদস্যবর্গকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।

২. শরীক রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে কমিটি এই সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যম সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

ধারা-৩৮
অন্যান্য অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিটির সম্পর্ক

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন তদারকি এবং সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রসমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উৎসাহিত করতে :

ক) বিশেষায়িত সংস্থা ও জাতিসংঘের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিধিবিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। কমিটি, তার বিবেচনায় যথার্থতা অনুযায়ী, বিশেষায়িত সংস্থা ও অন্যান্য সুদক্ষ অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে ঐসব সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির সাথে এই সনদের সাযুজ্যপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। কমিটি বিশেষায়িত সংস্থা এবং জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহকে তাদের কর্মপরিধির সাথে সংশ্লিষ্ট এই সনদের বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদান করতেও অনুরোধ করতে পারবে।

খ) কমিটি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথ বিবেচনায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাসঙ্গিক অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সাথে পরামর্শ করবে। এই পরামর্শের লক্ষ্য হবে তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন নির্দেশিকা, পরামর্শ এবং সাধারণ সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বৈততা ও পূনরাবৃত্তি পরিহার করা।

ধারা-৩৯
কমিটির প্রতিবেদন

কমিটি প্রতি দুই বছর অন্তর এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করবে। সেইসাথে কমিটি শরীক রাষ্ট্রের পেশকৃত প্রতিবেদন ও তথ্যের যাচাই-বাছাইয়ের উপর ভিত্তি করে পরামর্শ কিংবা সাধারণ সুপারিশ প্রণয়ন করবে। কমিটির প্রতিবেদনে এরূপ পরামর্শ ও সাধারণ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ সম্পর্কে শরীক রাষ্ট্রের কোন মন্তব্য থাকলে তাও অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

ধারা-৪০
শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন

১. শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যে কোন বিষয় বিবেচনার জন্য নিয়মিত শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করবে।

২. এই সনদ বলবৎ হবার ছয় মাস অতিবাহিত হবার পূর্বেই জাতিসংঘের মহাসচিব শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন আহ্বান করবেন। পরবর্তী সভাসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিব দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে কিংবা শরীক রাষ্ট্রসমূহের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আহ্বান করবেন।

ধারা-৪১
সংরক্ষক

জাতিসংঘের মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষক হবেন।

ধারা-৪২
স্বাক্ষর

এই সনদ নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৩
সম্মতির বাধ্যবাধকতা

এই সনদ স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের অনুস্বাক্ষর এবং স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবে। স্বাক্ষর করেনি এমন রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার বিবেচনার জন্য এই সনদ উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-৪৪
আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদের আওতাভূক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি ঘোষনা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে সংরক্ষককে অবহিত করবে।

২. এই সনদে "শরীক রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরণের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শীতার সীমার মধ্যে।

৩. এই সনদের ৪৫ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ৪৭ নম্বর ধারার ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শীতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই সনদ স্বাক্ষরকারী তাদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। সনদের কোন শরীক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরণের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন সদস্য রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

ধারা-৪৫
কার্যকারিতা

১. এই সনদ বিশতম অনুস্বাক্ষর বা অনুমোদন লাভ করবার দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

২. সনদে প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার অনুস্বাক্ষর, আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ কিংবা সম্মতিজ্ঞাপনের পরে, এ ধরনের সর্বমোট বিশটি সমর্থন অর্জিত হলে, প্রত্যেক শরীক রাষ্ট্রের সম্মতিজ্ঞাপনের দিন থেকে পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে সনদটি কার্যকর হবে।

ধারা-৪৬
আপত্তি

১. এই সনদের উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কোন আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যে কোন সময় প্রত্যাহার করা যাবে।

ধারা-৪৭
সংশোধনী

১. যে কোন শরীক রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই সনদের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যেকোন প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরণের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি শরীক রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত শরীক রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল শরীক রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য পেশ করা হবে।

২. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যে কোন শরীক রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল শরীক রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

৩. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোন সংশোধনী, যা একান্তভাবে ৩৪, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর ধারার সাথে সম্পর্কিত, দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে।

ধারা-৪৮
সমর্থন প্রত্যাহার

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন শরীক রাষ্ট্র এই সনদ সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ করতে তথা তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। এই

শরীকানা বা সমর্থন প্রত্যাহার মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

ধারা-৪৯
সহজে ব্যবহার উপযোগি শৈলী বা ফরম্যাট

এই সনদ সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট বা ফরম্যাটের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

ধারা-৫০
প্রামাণ্য পাঠ

এই সনদের আরবি, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই সনদে স্বাক্ষর করলেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হয় :

ধারা-১

১. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরীক রাষ্ট্র ("শরীক রাষ্ট্র") স্বীকার করে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিষয়ক কমিটির ("কমিটি") কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সনদের বিধিবিধান লঙ্ঘনের শিকার হিসেবে দাবিদার এখতিয়ারসম্পন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির নিকট হতে বা তাদের পক্ষে অভিযোগ গ্রহণ এবং বিবেচনা করার যোগ্যতা রয়েছে।

২. সনদের শরীক কিন্তু এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের শরীক নয় এমন কোন রাষ্ট্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ কমিটি গ্রহণ করবে না।

ধারা-২

কমিটি কোন অভিযোগকে অগ্রহণীয় বলে বিবেচনা করবে যদি :

(ক) অভিযোগটি বেনামি হয়;

(খ) অভিযোগটি অভিযোগ দায়ের করবার অধিকারের অপব্যবহার হয় কিংবা সনদের বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়;

(গ) কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে পরীক্ষিত একই বিষয় অথবা তা অন্য কোন আন্তর্জাতিক তদন্ত বা সালিশ কার্যক্রমের অধীনে পরীক্ষিত হয়েছে বা হচ্ছে;

(ঘ) বিদ্যমান সকল স্থানীয় সমাধান-ব্যবস্থাদির দ্বারস্থ না হয়েই করা হয়। এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না যদি স্থানীয় সমাধান-ব্যবস্থার ফল পেতে অযথা বিলম্ব হয় অথবা তা থেকে কার্যকর সমাধান পাবার সম্ভাবনায় সন্দেহ থাকে;

(ঙ) অভিযোগটি সুস্পষ্টতই ভিত্তিহীন বা পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই করা হয়ে থাকে। কিংবা যদি;

(চ) সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রের প্রতি অভিযোগের ঘটনাবলী এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান কার্যকর হবার পূর্বে ঘটে থাকে, যদি না সেই সকল ঘটনা উক্ত তারিখের পরেও চলতে থাকে।

ধারা-৩

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ২ নম্বর ধারার বিধানাবলী অনুসারে, কমিটি তার নিকট গোপনীয়ভাবে প্রেরিত কোন অভিযোগ বিষয়ে রাষ্ট্র পক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। অভিযোগপ্রাপ্ত রাষ্ট্র ছয় মাসের মধ্যে কমিটির নিকট ঘটনার ও তার সমাধানে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকলে, তা সহ লিখিত ব্যাখ্যা বা বিবৃতি প্রেরণ করবে।

ধারা-৪

১. অভিযোগ প্রাপ্তির পরে যেকোন সময় এবং অভিযোগ আমলযোগ্য কিনা তা বিবেচনায় নেবার পূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সম্ভাব্য অপূরণীয় ক্ষতি এড়াতে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য যথোপযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে পারবে।

২. এই ধারার প্রথম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অভিযোগের গ্রহণযোগ্যতা বা আমলযোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিটির স্বীয় বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ প্রযোজ্য হবে না।

ধারা-৫

কমিটি এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান বিষয়ক কোন অভিযোগ পরীক্ষা করতে রূদ্ধদ্বার বৈঠক করবে। অভিযোগ বিষয়ে যদি কোন নির্দেশ ও সুপারিশ থাকে তবে কমিটি তা সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র ও আবেদনকারির বরাবর প্রেরণ করবে।

ধারা-৬

১. কোন শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহের গুরুতর বা ক্রমাগত লঙ্ঘনের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে প্রাপ্ত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে সহায়তার এবং উক্ত তথ্য সংক্রান্ত মতামত প্রদানের আহ্বান জানাবে।

২. সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত কোন মতামত বা প্রাপ্ত অন্য কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বিবেচনা করে ঐ বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা ও জরুরি ভিত্তিতে কমিটির নিকট প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটি তার এক বা একাধিক সদস্যকে নিয়োগ করতে পারে। তদন্তের প্রয়োজনে এবং সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ঐ রাষ্ট্র পরিদর্শনও এরূপ তদন্তের অংশ হতে পারে।

৩. এরূপ তদন্তের ফলাফল যাচাইয়ের পর কমিটি তার মন্তব্য এবং সুপারিশসহ তা সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে প্রেরণ করবে।

৪. কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তদন্তের ফলাফল, মন্তব্য ও সুপারিশ পাবার ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্র কমিটিকে তার অভিমত অবহিত করবে।

৫. এরূপ তদন্ত গোপনীয়তার সাথে পরিচালিত হবে এবং তদন্ত প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে শরীক রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হবে।

ধারা-৭

১. কমিটি সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ৬ নম্বর ধারার অধীনে অনুষ্ঠিত তদন্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপের বিস্তারিত বিবরণ, সনদের ৩৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী তার প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

২. কমিটি, প্রয়োজনবোধে, ৬ নম্বর ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর কোন সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রকে এরূপ তদন্তের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহের ব্যাপারে কমিটিকে অবহিত করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে।

ধারা-৮

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান স্বাক্ষর বা অনুস্বাক্ষরের সময় বা পরবর্তীতে এর শরীক হবার সময় কোন শরীক রাষ্ট্র ৬ ও ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত কমিটির যোগ্যতা অস্বীকারের ঘোষণা দিতে পারবে।

ধারা-৯

জাতিসংঘের মহাসচিব এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের সংরক্ষক হবেন।

ধারা-১০

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে সকল রাষ্ট্র ও আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা কর্তৃক স্বাক্ষরের জন্য ৩০ মার্চ ২০০৭ হতে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা-১১

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যারা সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে বা সম্মতি প্রদান করেছে কেবল সে সকল রাষ্ট্রই এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান অনুস্বাক্ষর করতে পারবে। এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাসমূহের মধ্যে যারা আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ অনুমোদন করেছে বা তাতে সম্মত হয়েছে, তাদেরকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিতে হবে। যেসব রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয়ক সংস্থা ইতোমধ্যেই সনদ অনুস্বাক্ষর করেছে বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিয়েছে বা

তাতে সম্মত হয়েছে কিন্তু এই বিধি-বিধান স্বাক্ষর করেনি, তাদের অন্তর্ভুক্তির জন্য এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা ১২

১. "আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা" বলতে বুঝাবে কোন একটি অঞ্চলের সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক গঠিত একটি সংস্থা, যার কাছে এর শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের আওতাভুক্ত বিষয়াদি পরিচালনার কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। এই সকল সংস্থা তাদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দলিলে বা সম্মতিপত্রে এই সনদ ও ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান-নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর তাদের বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যাপ্তি ঘোষনা করবে। এরই ধারাবাহিকতায়, সংস্থাসমূহ তাদের পারদর্শীতার ক্ষেত্রে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে সংরক্ষককে অবহিত করবে।

২. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানে উল্লেখিত "শরীক রাষ্ট্রসমূহের" জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ এই ধরণের সংস্থার জন্যও প্রযোজ্য হবে; তবে তা হবে তাদের পারদর্শীতার সীমার মধ্যে।

৩. এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের ১৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদের অভীষ্ট লক্ষ্যের জন্য কোন আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার কোন আইনী প্রস্তাবনা বিবেচিত হবে না।

৪. আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থা, তাদের পারদর্শীতার অন্তর্গত বিষয়াবলীতে, শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থাগুলো এই প্রতিপালনীয় বিধিবিধান স্বাক্ষরকারী তাদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করতে পারবে। কোন শরীক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এ ধরণের সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না; অথবা, বিপরীতক্রমে, কোন আঞ্চলিক সমন্বয়ক সংস্থা তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করলে এই সনদ স্বাক্ষরকারী ঐ সংস্থার কোন শরীক রাষ্ট্র তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে না।

ধারা-১৩

১. সনদ কার্যকর হওয়া সাপেক্ষে, অনুসাক্ষর বা অনুমোদনের দশম দলিল জমা হবার ত্রিশতম দিবস থেকে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান কার্যকর হবে।

২. এরূপ দশটি দলিল জমা হবার পর এই বিধিবিধান অনুস্বাক্ষরকারি বা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন প্রদানকারী বা এতে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র বা আঞ্চলিক সমন্বয় সংস্থার ক্ষেত্রে, তাদের নিজ নিজ দলিল জমা দেবার ত্রিশতম দিবস থেকে এই ঐচ্ছিক বিধিবিধান কার্যকর হবে।

ধারা-১৪

১. এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আপত্তি অনুমতি পাবে না।

২. আপত্তি যে কোন সময় তুলে নেয়া যেতে পারে।

ধারা-১৫

১. যে কোন শরীক রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। মহাসচিব যেকোন প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন এবং একটি অনুরোধমূলক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো বিবেচনা ও এগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের একটি সম্মেলন সমর্থন করেন কি-না তা জানতে চাইবেন। এই ধরণের যোগাযোগের তারিখের চার মাসের মধ্যে যদি শরীক রাষ্ট্রগুলোর কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ এই সম্মেলন সমর্থন করে তাহলে মহাসচিব জাতিসংঘের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করবেন। উপস্থিত শরীক রাষ্ট্রসমূহের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত কোন সংশোধনী মহাসচিব কর্তৃক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে এবং অতঃপর ঐ সংশোধনী সকল শরীক রাষ্ট্রের নিকট তাদের গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে।

২. এই ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে গৃহীত ও অনুমোদিত কোন সংশোধনী দুই তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের পরে ত্রিশতম দিবসে কার্যকর হবে। অতঃপর, যে কোন শরীক রাষ্ট্রের অনুমোদনের দিন থেকে ত্রিশতম দিবসে সংশোধনীটি ঐ রাষ্ট্রের জন্য কার্যকর হবে। কোন সংশোধনী কেবল সেই সকল শরীক রাষ্ট্রের জন্যই বাধ্যতামূলক হবে, যারা এটি গ্রহণ করেছে।

ধারা ১৬

জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে কোন শরীক রাষ্ট্র এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সম্পর্কে ভিন্ন মত প্রকাশ ও তার সমর্থন প্রত্যাহার করতে পারবে। সমর্থনের প্রত্যাহার মহাসচিব-কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির এক বছর পর কার্যকর হবে।

ধারা ১৭

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধান সকলের ব্যবহার উপযোগী যথাযথ ফরম্যাট বা শৈলীর মাধ্যমে সহজলভ্য করা হবে।

ধারা ১৮

এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানের আরবি, চীনা, ইংরেজী, ফরাসী, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার পাঠ সমভাবে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

তাদের নিজ নিজ সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে এই ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধিবিধানে স্বাক্ষর করলেন।